উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

দ্বিতীয় সেমেষ্টার

অনুবাদ সাহিত্য

কোর পত্র - ২০৪

পর্যায় - খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ঃ ক

একক-১ মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট, অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির কারণ

একক-২ কৃত্তিবাসী রামায়ণের কবি পরিচয় কৃত্তিবাস সমস্যা বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা, সংস্কৃত রামায়ণের গুরুত্ব

একক-৩ কৃত্তিবাসের কাব্যকাহিনীর মৌলিকতা ও মূলানুগত্যের পরিচয়, চরিত্র বিচার, রস বিচার এবং অনুবাদক হিসেবে কৃত্তিবাসের অবদান

একক-৪ কৃত্তিবাসী রামায়াণে বাঙালিয়ানার প্রভাব, ভাষা ছন্দ ও অলঙ্কারের কৃতিত্ব ও ভক্তিবাদ

একক-৫ ভাগবতের অনুবাদ, কাব্য কাহিনীর উৎস ও পরিচয়, রচনাকাল ও গৌড়েশ্বর প্রসঙ্গ

একক-৬ মালাধর বসুর কবিত্ব, বাঙালিয়ানা কবিপ্রতিভা ও কাব্যের মূল্যায়ন

একক-৭ ভাগবত অনুবাদ কম হওয়ার কারণ, অনুবাদক হিসেবে মালাধর বসুর বিশেষত্ব, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভক্তি প্রসঙ্গ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ঐশ্বর্যলীলাই মুখ্য মধুর লীলা গৌণ

পর্যায় ঃ খ

একক-৮ অনুবাদে মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত ও কাব্যরচনার উৎস

একক-৯ মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে কাশীরাম দাসের পরিচয়, কাশীদাসী মহাভারতের রচনাকাল, কাশীদাসী হাভারতের কাব্যবৈশিষ্ট্য

একক-১০ কাব্যগত আবেদনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবিত্ব পরিচয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রামাণিকতা

একক-১১ কাশীদাসী মহাভারতে শিল্পরীতি, বাঙালিয়ানার অভাব ও পরবর্তী বাংলা কাব্য

একক-১২ মুসলিম সাহিত্য, সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের কৃতিত্ব, সপ্তদশ শতকের চট্টগ্রাম রোসাঙের দরবারি সাহিত্য

একক-১৩ পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী প্রসঙ্গ, কবি পরিচিতি, মাগন প্রসঙ্গ, কাব্যের উৎস, রসবিচার, পদ্মাবতী রূপক না রোমান্স কাব্য।

একক-১৪ আলাওলের ধর্মবোধ ও পদ্মাবতী কাব্যে সুফী প্রভাব, কাব্যের ঐতিহাসিকতা, পদ্মাবতী কাব্যের ভাষা ও ছন্দ, সমাজ সংস্কৃতি, পদ্মাবৎ ও পদ্মাবতীর তুলনা, পদ্মাবতী কাব্যে গান।

কোর পত্র - ২০৪ অনুবাদ সাহিত্য

পর্যায় ঃ খ

একক-৮

মহাভারতের অনুবাদ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কাশীরাম দাসের কাব্যরচনার উৎস

একক-৯

মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে কাশীরাম দাসের পরিচয়, কাশীরাম দাসের মহাভারতের রচনাকাল, কাশীদাসী মহাভারতের কাব্যবৈশিষ্ট্য,

একক-১০

কাব্যগত আবেদনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত, কাশীরাম দাসের কবিত্ব পরিচয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রামাণিকতা

একক-১১

কাশীদাসী মহাভারতে শিল্পরীতি, কাশীদাসী মহাভারতে বাঙালিয়ানার অভাব, কাশীরাম দাস ও পরবর্তী বাংলা কাব্য

একক-১২

মুসলিম সাহিত্য, সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের কৃতিত্ব, সপ্তদশ শতাব্দীর চট্টগ্রামের রোসাঙের দরবারি সাহিত্য

একক-১৩

পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী প্রসঙ্গ, কবি পরিচয়, মাগন পরিচয় ও পদ্মাবতী কাব্যে মাগন প্রসঙ্গ

একক-১৪

পদ্মাবতী কাব্যের উৎস, পদ্মাবতী কাব্যের রসবিচার ও পরিণামগত ----
পদ্মাবতী রূপক না রোমান্স কাব্য

একক - ৮ অনুবাদে মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত ও কাব্যরচনার উৎস।

বিন্যাসক্রম -

৮.১। মহাভারতের অনুবাদ

৮.২। কাশীরাম দাসের মহাভারত

৮.৩। কাশীরাম দাসের কাব্যরচনার উৎস

৮.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

৮.৫। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৮.১। মহাভারতের অনুবাদ

তুর্কি আক্রমনোত্তর বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ ও ভাগবত অনুবাদের প্রধান প্রেরণা ছিল 'লৌকিক নিস্তারণ' ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আকাঙ্ক্ষা। তাছাড়া বাঙালি জাতিকে শক্তি ও বীর্যের মন্ত্রে জাগিয়ে তোলাও ছিল সে যুগের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু মহাভারতের অনুবাদের জন্য বাঙালিকে চৈতন্যের কাল কিংবা চৈতন্যোত্তর কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। চৈতন্যদেবের প্রভাবে ভক্তিব্যাকুল বাঙালির জীবনে দেখা দেয় নতুন যুগচেতনা ও যুগধর্ম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাগানুগা ভক্তির প্রভাব মহাভারতের বীর্যদীপ্ত পৌরুষ ও ঐশ্বর্যভার মিশ্রিত ও প্রশমিত হয়ে ভক্তিরসের দিকে ধাবিত হয়। মহাশক্তিশালী সুদর্শন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসসিক্ত কোমল বাঙালির দৃষ্টিতে দ্রৌপদী-সখা ও পার্থসখায় পরিণত হ'ন।

রামায়ণ ও ভাগবত অনুবাদের এত সময় পরে মহাভারত অনুবাদের কারণ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের অভিমত এইরকম, ''বাংলার পুরাতন সাহিত্যে ভারত পাঁচালীর উদ্ভব ও প্রসার প্রধানত রাজদরবারের আওতায়ই হইয়াছিল।'' এককথায় মুসলমান শাসকদের কাব্যানুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই মহাভারতের অনুবাদ সম্ভব হতে পেরেছিল। তাছছাড়া মহাভারতকে বাঙালির জীবনচর্যা ও ভাবসাধনার অনুগামী করে নেওয়া যখন সম্ভব হয়েছে, সেই অনুকূল মুহূর্তেই মহাভারত অনুবাদের দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে। রচনাকালের বিচারে রামায়ণ, মহাভারতের পূর্বে রচিত। এই ব্যাপারে শ্রীভূদেব চৌধুরীর অভিমত হ'ল, ''ষোড়শ শতকের আগে বাংলাভাষায় 'মহাভারত' রচনার সূচনা হয়েছিল বলে জানা যানি। অথচ, এই কালসীমায় অন্তত একশ বছর আগে

মন্তব্য

থেকেই বাংলা অনুবাদকাব্য হিসেবে ‘রামায়ণ’ ও ‘ভাগবত’ জনপ্রিয়তার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল” (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ২ম পর্যায়)। এর কারণ স্বরূপ মহাভারত অনুবাদের উদ্ভব ও প্রসারের জন্য রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারতের আদি কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস। তার এই বিখ্যাত কাব্যের শ্লোকসংখ্যা ছিল ৮,৮০০। পরবর্তীকালে নানাভাবে সংযোজিত হয়ে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৪,০০০ এবং কাব্যটি একটি বিরাট সংহিতার আকার ধারণ করে। পঞ্চমবেদ হিসেবে পরিচিত এই সুবিশাল গ্রন্থটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত, ‘‘ইহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।” বাস্তবকিই ভারতীয় জাতির অন্তরাত্মা এই মহাকাব্যের স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত পুষ্প স্তবকের মত বিকশিত। এই কাব্যটির মধ্যে সমগ্র জাতির ধর্মমত, আদর্শ, নীতি, সাধনা, সমাজ ও ইতিহাসের নানা তথ্য ও দার্শনিক মনন ঠাঁই করে নিয়েছে। সেই কারণেই বলা হয়, যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।’ এই কাব্যটির চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ মন্তব্য করেছেন, ‘‘ভারতের অমৃত আত্মা, জীবনের সমগ্র সত্তা, প্রাণ ও মনের ক্ষুধা ও সুধা সমস্তই মহাভারতের শিলাস্তূপে এখনও যেন মৃত্যুঞ্জয় হয়ে আছে। রাম-রাবণের যুদ্ধ-নিনাদ সিংহলের সমুদ্রতটে শান্তি লাভ করেছে; কিন্তু কুরুবংশের ভ্রাতৃবিরোধর অনাগতকালের বুকে দুরপনেয় ক্ষতচিহ্ন রূপে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে” (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। তাছাড়া মহাকাব্যটির বিষয় বৈচিত্র্য ও রসের বিভিন্নতা এবং নানা শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত আখ্যায়িকা একাধারে বিস্ময় ও কৌতুহল সৃষ্টিকারী। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত হ’ল, বিশেষত ইহার যুদ্ধ বর্ণনা রামায়ণের মত কেবল গাছ-পাথর-ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপার নয়, রাক্ষস ও বানরের বীভৎস রসপ্রধান শক্তি আস্পালনের ক্ষেত্র নয়। ইহার মধ্যে ব্যূহ- নির্মাণ, সৈনপত্য-কৌশল, কূট ষড়যন্ত্র ও মানবিক ঘাত প্রতিঘাতের প্রাধান্য। ইহাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিবরণ এবং রাজনীতি ও ধর্মনীতির সূক্ষ্ম আলোচনা অনেক স্থান অধিকার করে” (বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ঃ প্রথম খণ্ড আদি ও মধ্য যুগ)। একদিকে সংস্কৃত ভাষার মত ক্ল্যাসিক গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা, অন্যদিকে বিপুল কলেবর, বিচিত্র চরিত্র,

জটিল কাহিনি বিন্যাসের দুরূহতা অনুবাদের ক্ষেত্রে মহাভারতকে রীতিমত একটি সমস্যায় পরিণত করেছিল। তবু বাংলা ভাষায় কাশীরাম দাসের পূর্বে দু-একজন কবি এই অকুল সমুদ্র সন্তরণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কাশীরামের মত কেউই সফল হননি। তাছাড়া এঁরা কেউই কাশীরামের মতো সমগ্র মহাভারতের অনুবাদে মনোযোগী হননি। এবং তাঁর মতো মহতী প্রতিভার অধিকারীও ছিলেন না। তবু আদি অনুবাদক হিসেবে তাঁদের প্রচেষ্টাকে কোনাভাবেই খর্ব করা যাবে না। মহাভারতের প্রাচীন অনুবাদক হিসেবে এ পর্যন্ত চারজন কবির নাম পাওয়া গেছে— (১) কবীন্দ্র পরমেশ্বর, (২) শ্রীকর নন্দী, (৩) সঞ্জয়, (৪) বিজয়পণ্ডিত। এই কবিদের অস্তিত্বের প্রামাণিকতা নিয়ে নানান মতভেদ থাকলেও মোটামুটি প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে উক্ত চারজন কবিরই কাব্য পরিচয় গ্রহণ করব।

মন্তব্য

৮.২। কাশীরাম দাসের মহাভারত

কাশীরাম দাসের কবিপ্রশস্তি করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— ''কৃত্তিবাসের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া এই কায়স্থ কবি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন... বস্তুত বাঙালির সমস্ত জাতি-মানস, ব্যক্তি জীবন, সামাজিক আদর্শ ও নীতি কর্তব্যকে এই দুইজন কবি যেভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ব্যাস বাল্মীকির মতো আর্য কবি বইতে ইচ্ছা করে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। কাশীরাম দাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি মধুসূদন উচ্চারণ করেছেন—

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।।'

অন্যদিকে শ্রীচৌধুরী অভিমত প্রকাশ করেছেন, ''সপ্তদশ শতকের কবি সমাজে প্রথমেই সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় নাম কাশীরাম দাসের। এই মহাকবির সাধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েই রাজসভার কাব্য 'মহাভারত' সাধারণ বাঙালির জীবন-বেদীতে চিরন্তন প্রতিষ্ঠার অধিকার অর্জন করেছিল'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)। প্রাচীন মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের মতো কাশীরাম দাসকে নিয়েও কম বিতর্ক তৈরী হয়নি। যেমন— বিপুল মহাভারত মহাকাব্যের সবটা কাশীরামের নিজের রচনা নয়, পুত্র জামাতা ভ্রাতুষ্পুত্র

মন্তব্য

কিংবা অন্য কবিদের রচনাও কাশীরামের নামে প্রচলিত, ইত্যাদি। তবে এই বিতর্ক জটিলতার বাইরে একটি কথাই বলতে ইচ্ছে করে, ''কাশীরাম দাসের নামের এমন মহিমা যে, অনেক ছোট-বড়ো কবির রচনা তাঁহার কাব্যে আত্মদান করিয়া ধন্য হইয়াছে।... তাঁহার ভারত-পাঁচালীতে যতই ভেজাল চলিয়া যাক না কেন, তবু তাহার গৌরব ও মহিমার খর্বতা ঘটে নাই'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব।

৮.৩। কাশীরাম দাসের কাব্যরচনার উৎস

কাশীরামের পদবী ছিল 'দেব'। দেবের স্থলে দাস ব্যবহার করেছেন বিনয়বশত। তাছাড়া ধর্মবিশ্বাসে কাশীরাম ছিলেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন।

গদাধরের 'জগৎমঙ্গল' থেকে জানা যায়, কাশীরাম মেদিনীপুর জেলার আত্রাসগড়ের রাজার বাড়িতে শিক্ষকতা করতেন। কোন কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়, হরিহরপুরের অভিরাম মুখুটীর আশীর্বাদে ও নির্দেশে কাশীরাম 'ভারত পাঁচালী' রচনা করেন।

হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণ ধাম।
পুরুষোত্তম-নন্দন মুখুটী অভিরাম।।
কাশীরাম বিরচিল তাঁর আশীর্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে।

কবির আবির্ভাব কাল ও কাব্য রচনাকাল নিয়েও মতভেদ আছে। কবির ছোট ভাই গদাধর দাস 'জগৎমঙ্গল' রচনা করেছিলেন (১৬৪২-৪৩) খ্রিস্টাব্দে। এই কাব্যে কাশীরামের কাব্যের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং কাশীরামের কাব্য 'জগৎমঙ্গলের' পূর্বে রচিত। সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত কাশীরামের একটি পুঁথিতে পাওয়া যায় কাশীরামের কাব্য ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত। ১৮৬৬ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রকাশিত মূল মহাভারতে আছে—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।।

সুতরাং অনুমান করা হয় কাশীরাম সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেননি। অনুমান

করা হয়, কাশীরামের পরিবারের যেহেতু সকলেই অল্পবিস্তর কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাই শেষ পর্বগুলিতে তাঁদের হস্তক্ষেপ পড়তে পারে। তাছাড়া রচনারীতির দিক থেকে প্রথম চারটি পর্বে যে সংহতি তা শেষের পর্বগুলিতে অনুপস্থিত। সমালোচকদের মতে, কবি তিরোধানের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র দুজনে মিলে কাব্যটি সমাপ্ত করেন।

৮.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। কাশীরাম দাসের মহাভারতের রচনাকাল সূচক শ্লোকটি উল্লেখ করো।

২। কাশীরাম দাস মহাভারতের মূল থেকে বিচ্যুত হয়েছেন কোন পর্বে এসে?

৩। কাশীরাম দাস তাঁর কাব্যে গ্রামীণ বাংলা কাব্য ছন্দের পরিবর্তে কোন ধরনের শব্দ বেশি প্রয়োগ করেছেন।

৪। কাশীদাসী মহাভারতের কাব্যবৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৫। মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে কাশীরাম দাসের পরিচয় দাও।

৬। কাশীরাম দাসের কাব্যরচনার উৎস ও রচনাকাল উল্লেখ করো।

৮.৫। সহায়ক পঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - দেবেশ আচার্য।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীমন্ত কুমার জানা।

মন্তব্য

একক-৯ মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে কাশীরাম দাসের পরিচয়, কাশীদাসী মহাভারতের রচনাকাল, কাশীদাসী মহাভারতের কাব্যবৈশিষ্ট্য।

বিন্যাসক্রম —

৯.১। কাশীরাম দাসের মহাভারতের রচনাকাল

৯.২। মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে কাশীরাম দাসের পরিচয়

৯.৩। কাশীদাসী মহাভারতের কাব্যবৈশিষ্ট্য

৯.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

৯.৫। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৯.১। কাশীরাম দাসের মহাভারতের রচনাকাল

ড. সুকুমার সেন কাশীরাম দাসের 'মহাভারতে'র রচনাকাল প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''কাশীরামের কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে যেটুকু তথ্যের-সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা খুব নির্ভরযোগ্য না হইলেও আপাতত নেওয়া চলে। ১২২৬ সালে (১৮১৯ অব্দে) লেখা একটি বিরাট পর্বের পুঁথির শেষে রচনা সমাপ্তিকাল দেওয়া আছে— ''চন্দ্রবাণ পক্ষ ঋতু'' অর্থাৎ ১৫২৬ শকাব্দ (১৬০৪-১৬০৫ অব্দ)'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ দ্বিতীয় খণ্ড) রচনাকাল সূচক ঐ শ্লোকটি হ'ল—

'চন্দ্রবাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হৈল সাঙ্গ কাশীদাস কয়।।'

অঙ্কের দক্ষিণগতি বিচারে কাশীদাসের কাব্য অন্ততঃ ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের কিংবা তার কিছুটা আগে রচিত হয়ে থাকবে। অন্যদিকে বিষ্ণুপুরের রাজা রাধাদামোদর সিংহের কালে লেখা আদি পর্বের একটি পুঁথিতে আর একজাতীয় রচনাকালের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—

'শকাঙ্ক বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে।
রুক্মিনীনন্দন অঙ্কে জননিধি সনে।।'

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই অঙ্ক বিচার করে রচনাকাল পেয়েছেন, ১৫২৪-২৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত (চারপর্ব)

মোটামুটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর আগে রচিত হয়ে থাকবে। কিন্তু নানা সময়ের বেশ কিছু পুঁথির পরিচয় ইত্যাদি বিভিন্নরকমের সংশয়ে কাশীদাসী মহাভারতের রচনাকাল সংশয়াচ্ছন্ন। তা সত্ত্বেও ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, ''যাহা হউক দ্বিমতের অবকাশ রাখিয়া একথা বলা চলিতে পারে যে, কাশীরামদাসি) ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার মহাভারতের চারিপর্ব ও বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, অন্ততঃ ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে (এই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ গদাধরের 'জগৎমঙ্গল' রচিত হয়) রচিত হইয়া থাকিবে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। মন্তব্য

৯.২। মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে কাশীরাম দাসের পরিচয়

কাশীরাম তাঁর 'মহাভারত' কাব্যের দুই একটি জায়গায় নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। একটি পুঁথির আত্মপরিচয় এইরকম—

'ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম।।
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।।
পাঁচালি প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ।।'

কাশীরাম দাসেরা তিন ভাই— কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর দাস। কৃষ্ণদাস ও গদাধর দাসের নামেও কাব্য পাওয়া গেছে। যাইহোক ইন্দ্রাণী বা ইন্দ্রবনী পরগণার 'সিঙ্গি', মতান্তরে 'সিদ্ধি' গ্রামে কায়স্থ বংশে কাশীরামের জন্ম হয়। কাশীরামের কৌলিক পদবী 'দেব'; কিন্তু কবিরা তিন ভাইই নিজ নিজ কাব্যে বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুসরণে 'দাস'-ব্যবহার করেছেন। কোন এক হরিহরপুরের অভিরাম মুখুটির আশীর্বাদ ও নির্দেশে কাশীরাম তাঁর গ্রন্থ ''ভারত পাঁচালী'' রচনায় উদ্যোগী হ'ন—

'হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম।

পুরুষোত্তম-নন্দন মুখটি অভিরাম।।
কাশীরাম বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে।'

কাশীরামের নামে প্রচলিত কাব্যের কতটুকু কবির নিজস্ব, কতটুকুই বা অপরের রচনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় বর্তমান। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন, ''কাশীদাস যে গোটা মহাভারত অনুবাদ করেন নাই, এরূপ বহু প্রমাণ পুঁথির মধ্যেই আছে। এই পুঁথির উল্লেখ হইতে মনে হয়, তিনি বোধহয় তিন বা চার পর্ব রচনার পর লোকান্তরিত হন, এবং বাকি অংশ তাঁহার জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র মিলিয়া সম্পূর্ণ করেন'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। এই রকম দুই একটি পুঁথির বর্ণনা—

(১) 'ধন্য ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারতের করিল প্রকাশ।।'

(২) 'ধন্য ধন্য কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
চারিপর্ব্ব ভারতের করিল প্রকাশ।।
আদিসভা বন বিরাট রচিয়া পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি।।'

সর্বোপরি ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারতের উপসংহারে লিখিত আছে—

'আদি সবা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।।''

কোন কোন কাব্যে এর বিপরীত ধারণা প্রতিষ্ঠিত। যেমন— 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে—

'অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ।।'

''কিন্তু কাশীরামের ভণিতায় যাহা রচিত হইয়াছে তাহার সবটা তাঁহার রচিত নহে, তাহার নানা প্রমাণ আছে। এ পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে,

মহাভারতের আদি-সভা-বন-বিরাট পর্বগুলি কাশীরামের নিজস্ব রচনা হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও অপর কবিরা অন্য পর্বগুলির সম্পূর্ণতা সাধন করেন" (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামের বর্ণনায় এর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে— মন্তব্য

"কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা।
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা।।
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিহঁ খুল্লতাত।
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ।।
আত্মত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক।
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক।।"

* * *

"কাশীদাস মহাশয় আশীর্বাদ দিল।
তাহার প্রসাদে আমি পূরাণ রচিল।।"

এই ব্যাপারে শ্রী ভূদেব চৌধুরীর অভিমত হ'ল, "স্পষ্টই বোঝা গেল, 'যম-দায়' হেতু কাশীরামের 'মহাভারত' কাব্য সমাপ্ত হতে পারেনি। নন্দরাম এই অসমাপ্ত কাব্যের কতটুকু অংশ লিখে সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন, সে সম্পর্কেও সংশয় আছে" (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)।

৯.৩। কাশীদাসী মহাভারতের কাব্যবৈশিষ্ট্য

অনুবাদের ক্ষেত্রে কাশীরাম হুবহু অনুবাদ করেননি। তিনি কৃত্তিবাসের মতো মর্মানুবাদ করেছেন। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে, রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য তাদের উপযোগী করে কবি তাঁর মহাভারত রচনা করেছেন। কাশীরামের মহাভারত রচনার উদ্দেশ্যও ধর্মমূলক। কাব্যে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

যেই বাঞ্ছা করি লোক শুনয়ে ভারত।
গোবিন্দ করেন পূর্ণ তার মনোরথ।।

কাশীরাম পণ্ডিত কবি ছিলেন। কাশীরাম ব্যাসদেবের মূল সংস্কৃত মহাভারতের

মন্তব্য বেশ কিছু অংশ গ্রহণ-বর্জন করেছেন। সংস্কৃত মহাভারত ছাড়াও নানা পুরাণ ও উপপুরাণ থেকে কাশীরাম তাঁর কাব্যে কাহিনির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যেমন, শ্রীবৎস চিন্তার উপাখ্যান, পারিজাত হরণ, সত্যভামা তুলাব্রত, রাসূয় যজ্ঞে বিভীষণের আগমন প্রভৃতি ঘটনা ব্যাসদেবের মহাভারতে নেই।

কাশীরাম যে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, তার বড় প্রমাণ ব্যাসদেবের মহাভারতের সঙ্গে যথেষ্ট ভাষাগত সাদৃশ্য তাঁর কাব্যের। সংস্কৃত ভালো না জানলে কাশীরাম এভাবে ব্যাসদেবের মহাভারতের স্বচ্ছ অনুবাদ করতে পারতেন না যেমন,

বৈয়াসকী মহাভারত ঃ অর্থানামর্জনে দুঃখং বর্ধনে রক্ষণে তথা।
তেষাং হি বৈরিনো জ্ঞাতি বহ্নি তস্কর পার্থিবাঃ।।

কাশীরামের মহাভারত ঃ উপার্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণ।।
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরি রাজা-অগ্নি-চোর-বন্ধুজন।।

কাশীরাম অনুবাদের ক্ষেত্রে যে মুলকেই অনুসরণ করেছেন তা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই স্পষ্ট হবে। যেমন—

বৈয়াসকী মহাভারত ঃ দ্রৌপদীর উৎপত্তি ও বর্ণনা 'কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিত'।

কাশীদাসী মহাভারতের আদি পর্বে এই বর্ণনা হল ঃ

তবে এই যজ্ঞমধ্যে কন্যার উৎপত্তি।
জন্মমাত্র দশদিক করে মহাচ্যুতি।।

বৈয়াসকী মহাভারত ঃ সভাপর্বে ইন্দ্রপ্রস্থে দুর্যোধনের প্রমাদ—
স কদাচিৎ সভামধ্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
স্পটিকং জলমাসাদ্য জলমিত্যভি শঙ্কয়া।

কাশীদাসী মহাভারত ঃ সভাপর্ব,
বিহার মাতুল সহ করে নরবর।

স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর।। মন্তব্য

জল আনি নরপতি গুটায় বসন।

পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন্।।

বৈয়াসকী মহাভারতে বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বকের প্রশ্ন ঃ

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চমোদতে।

মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্ব। জলং পিব।।

কাশীদাসী মহাভারতে— কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য পথ বলি কারে।

কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে।।

পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।

উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি।।

কোন কোন ক্ষেত্রে কাশীরাম মূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে বৈচিত্র্যে ভরিয়ে দিয়েছেন। যেমন, সভাপর্বে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বর্ণনা ঃ

একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী।

দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি।।

সংকটে পড়িয়া দেবী সজল নয়নে।

আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে নারায়ণে।।

কাশীরাম দাস নতুন বেশ কিছু বিষয়ও যোগ করেছেন। যেমন, বনপর্বে শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য, শান্তিপর্বে একাদশী মাহাত্ম্য ও হরিমন্দির মার্জনের ফল প্রভৃতি মূল মহাভারতে নেই। এমনকি কাশীদাসী মহাভারতে হরিভক্তিবাদের যে প্রাধান্য তাও মূল মহাভারতে নেই।

কাশীদাসী মহাভারতে মূল থেকে বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশি অশ্বমেধ পর্বে। যেমন মূলের নীল রাজার কাহিনি কাশীদাসে নীলধ্বজ-জনা উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে। মধুসূদন তাঁর বীরঙ্গনা কাব্যে এই কাহিনি অনুসরণ করেছেন। সভাপর্বের হংসধ্বজ রাজার প্রসঙ্গ সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

কাশীরাম অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদের রীতিকে গ্রহণ করেছেন। ব্যাস ভারত

মন্তব্য

ও জৈমিনি ভারতের কাহিনির প্রভাবে কাশীরামের নামে প্রচলিত মহাভারতের কাহিনি পর্যায় বিন্যস্ত হয়েছে। কাশীরাম কোথাও আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক গল্পও সন্নিবেশ করেছেন, যদিও মূল মহাভারতের কাহিনির রস ক্ষুণ্ন হয়নি।

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম উভয়ে পাঁচালি রীতি অনুসরণ করলেও কাশীদাসের রচনার মধ্যে ভাষা ভঙ্গিমায় ক্লাসিক তৎসম শব্দের মাধ্যমে গ্রন্থন নৈপুণ্য সপ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে। যেমন, দুর্যোধন কন্যা লক্ষ্মণার রূপ বর্ণনা ঃ

অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুন্তল কমল প্রিয়বন্ধু।
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর রঙ্গিমা।
ভ্রুভঙ্গ অঙ্গন চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা।।

অর্জুনের রূপ বর্ণনা—

অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।।
... ...
ভুজযুগ নিন্দে নাগ আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুলম্বিত।।

একথা ঠিকই যে, কাশীরাম কৃত্তিবাসের মতো অনুবাদের ক্ষেত্রে মৌলিকতা দেখাতে পারেননি। কেননা কৃত্তিবাসের মধ্যে যে সহজ গ্রামীণ ঘরোয়া রূপ ছিল, তা কাশীরামের মধ্যে ছিল না।তবে একথা ভুললে চলবে না যে, কাশীরাম যখন কাব্যরচনা আরম্ভ করেন তখন সাহিত্যের আদর্শ ছিল চৈতন্য প্রভাবান্বিত উত্তরাপথের আদর্শ। সেজন্য গ্রামীণ বাংলা কাব্যছন্দের পরিবর্তে তৎসম শব্দপ্রাধান্য স্বাভাবিক ভাবেই এসে গিয়েছে কাশীরামের রচনায়।তাই কাশীরামের কাব্যে তৎসমব আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট। যেমন— চলৎচপলা, নিষ্কলঙ্ক ইন্দ্রজ্যোতিঃ ইত্যাদি।

কাশীরাম তার কাব্যে কৃত্রিম কাব্যকলার অনুসরণ করেছেন। সেজন্য তিনি তাঁর কাব্যে ঝংকারমুখর শব্দশৃঙ্খলকে অনুসরণ করেছেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনায় তিনি তৎসম শব্দবহুল যে ঘনপিনদ্ধ বাক্‌রীতি ব্যবহার করেছেন, তা প্রশংসনীয় ঃ

সহস্র মস্তক শোভে সহস্র নয়ন। মন্তব্য

সহস্র মুকুটমণি কিরীট ভূষণ।

সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল

সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল।

কাশীরামের মহাভারতের চরিত্রগুলি বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জীবনচর্যায় ধ্যানধারণায় মিশে গেছে। তাই ভীম ও অর্জুন মূল মহাভারতের মতো ক্ষাত্রতেজে দীপ্ত নয়। দ্রৌপদী তাই অনেকটাই কোমলমতি বাঙালি বধূ। সভাপর্বে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার যে কলহ বর্ণিত হয়েছে, তা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের দুই সতীনের কলহ স্মরণ করিয়ে দেয়। সভাস্থলে দ্রৌপদীর সঙ্গে ভীমপত্নী হিড়িম্বা আসন গ্রহণ করলে রুষ্টা দ্রৌপদী সপত্নীসুলভ ঈর্ষা বশে হিড়িম্বাকে কটু ভাষায় গালি দেন ঃ

কৃষ্ণা বলে, নহে দূর খলের প্রকৃতি।

আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি।।

কি আহার কি বিচার কোথায় শয়ন।

কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ।।

তার উত্তরে হিড়িম্বা দ্রৌপদীকে শাসিয়ে চলে ঃ

কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্যজালে।

দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণা প্রতি বলে।।

অকারণে পাঞ্চালি করিস অহঙ্কার।

পরে নিন্দা নাহি দেখ ছিদ্র আপনার।।

তারপর হিড়িম্বা পুত্র ঘটোৎকচের বিশেষ প্রশংসা করলে কৃষ্ণা ক্রুদ্ধা হয়ে বলেন, ‘‘পুত্রের করহ গর্ব খাও পুত্র মাথা।’’

দুই সতীনে এরপর শুরু হয় চুলোচুলি। শেষ পর্যন্ত কুন্তী এসে তা সামাল দেন। এই ঘটনা কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডী ও গঙ্গার কলহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সে যাই হোক, কাশীরাম এই ঘটনার দ্বারা কৌতুকরস সৃষ্টি যেমন করেছেন, তেমন তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রটিকেও উপহার দিতে পেরেছেন।

মন্তব্য কাশীদাসের মহাভারত আদ্যন্ত সুন্দর ও জীবন্ত। বর্ণনাগুলি সহজ ও স্বাভাবিক। যেমন আদি পর্বে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নপর সৈন্যদের চিত্র ঃ

যেদিকে পারিল যেতে সে গেল সেদিকে।
পলায় পশ্চিমবাসী রাজা পূর্ব্বদিকে।।
উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল।
পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিক পাইল।।

শিল্পরীতিতে কাশীরাম দাসের স্বকীয়তার পরিচয় তাঁর কাব্যে রয়েছে। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গে কাশীরাম অর্জুনের ক্ষাত্রজনোচিত চরিত্রধর্ম ও শারীরিক সৌন্দর্য অপূর্ব মণ্ডনকলায় মণ্ডিত করেছেন ঃ

দেব দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।।

কাশীদাসী মহাভারতের কোন কোন উক্তি প্রবাদের মতো প্রচলিত হয়ে আসছে। যেমনঃ

আপন অর্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নয়।।
কিংবা, প্রলয় সমুদ্র কিসে রাখিবেক কুলে।।
বালিবান্ধে কি করিবে নদীস্রোত জলে।।

কাশীরামের বৈষ্ণব ভক্তির পরিচয় রয়েছে তাঁর কাব্যে। যেমন,

কারণ-করণ-কর্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।।

এমনকি, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিবাদ সমাজে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রমাণ মেলে কাশীদাসী মহাভারতে।

বাঙালি সুদীর্ঘকাল ধরে পান করে আসছে কাশীদাসী কাব্যামৃতা। কাশীদাসী মহাভারতে এমন একটা বিশুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতা আছে, যা ভক্তি মিশ্রিত সহজ ধর্মবোধ সংযোগ আমাদের জাতীয় মনটিকে তৈরি করেছে, জাতীয় মনের সঙ্গে সঙ্গে আবার এ মহাভারতও গড়ে উঠেছে। তাই এই কাব্যকে লোককাব্য বলা চলে। সুতরাং এসব দিক থেকে কাশীরামের মহাভারত মহাভারতের অনুবাদ শাখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পরাগল, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, গঙ্গাদাস সেন কিংবা সঞ্জয় কেউই কাশীরামের সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে তুলনীয় হতে পারেন না। মন্তব্য

দীনেশচন্দ্র সেন পরবর্তী কালে কাশীদাসী মহাভারতের প্রভাবের দিক থেকে যথার্থ বলেছেন, ''বঙ্গদেশে এই মহাভারতসমুদ্র হইতে এখনও 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র', 'রেবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি অসংখ্য বুদ্‌বুদ্‌ উত্থিত হইয়া প্রাচীনভাবের অফুরন্ত আবেগ জ্ঞাপন করিতেছে। এই কাব্য লইয়া হিন্দুস্থানের ভাবী অধ্যায়ে আর কত কবি ও বীর চিত্রকর যশস্বী হইবেন, কে বলিতে পারে?''

৯.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। কাশীরাম দাসের মহাভারতের রচনাকাল উল্লেখ করো।

২। কাশীরাম দাসের কাব্যরচনার উৎস কি?

৩। কাশীরাম দাসের আসল পদবি কি ছিল?

৯.৫। সহায়ক পঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - দেবেশ আচার্য।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীমন্ত কুমার জানা।

একক - ১০ কাব্যগত আবেদনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবিত্ব পরিচয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রামাণিকতা।

বিন্যাসক্রম -

১০.১। কাব্যগত আবেদনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত

১০.২। কাশীরাম দাসের কবিত্ব পরিচয়

১০.৩। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রামাণিকতা

১০.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১০.৫। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১০.১। কাব্যগত আবেদনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত ঃ

ক) মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেণীবিন্যাসের প্রধানত চারটি পৃথক সাহিত্যধারা লক্ষ করা যায় ঃ মঙ্গলকাব্য, গীতিসাহিত্য, জীবনী সাহিত্যি এবং অনুবাদ সাহিত্য। এদের মধ্যে চৈতন্য-পূর্ব যুগের সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ অভিবযক্তির ধারক অনুবাদ সাহিত্য। প্রধানত তুর্কী আক্রমণের অঘাতে সেকালের বাঙালি সমাজের মনপ্রকৃতিতে অভিজাত ও অনভিজাতের সর্বমুখী মিলনের আকাঙ্ক্ষা উন্মুখ হয়েছিল। এই মিলনের প্রয়াসে অভিজাত হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পরিবাহক প্রখ্যাত মহাকাব্য ও পুরাণসমূহকে লোকভাষায় অনূদিত করবার প্রবল প্রেরণা এসেছিল। আজ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, কৃত্তিবাসের কবিকীর্তিকে আশ্রয় করেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদকর্মের এই প্রেরণা এসেছিল। আজ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, কৃত্তিবাসের কবিকীর্তিকে আশ্রয় করেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদকর্মের এই প্রেরণা প্রথম রূপলাভ করেছিল। তার পরের নাম ভাগবতের প্রখ্যাত অনুবাদক মালাধর বসু।

খ) চৈতন্য-পূর্ব যুগের অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে অভিজাত পৌরাণিক-ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যকে সংস্কৃত ভাষার আবরণ যুক্ত করে লোকসমাজে পরিব্যাপ্ত করে দেবার প্রয়াসই ছিল মুখ্য। সেই সঙ্গে ছিল সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলার লোক-ভাষা ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে তোলার পরোক্ষ আগ্রহ। তাই কৃত্তিবাস

ও মালাধরের অনুবাদ-সাহিত্য ভাবে এবং ভাষায় বহুলাংশে মূলানুগ ছিল বলে মনে করা হয়। সকালের বাঙালি জন-জীবনের পক্ষে ঐ কাব্য দুখানি ছিল বাংলার তুলনায় বেশি সংস্কৃত; তাদের ভাব ছিল লোক-চেতনার তুলনায় বেশি অভিজাত। মূলত এটিই চৈতন্যপূর্ব বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।

গ) কিন্তু চৈতন্যোত্তর অনুবাদ-সাহিত্য ততটা মূলানুগ নয়, যতটা ভাবানুবাদ। আবার ঐ অনুবাদের প্রয়াস সংস্কৃত মূলের চেয়ে সমকালীন বাঙালি জীবন-স্বভাবের অনুবর্তন করেছে বেশি। কারণ চৈতন্যদেব ছিলেন সেই পূর্ণায়ত ভাববিগ্রহ, যাঁর জীবনসাধনায় অভিজাত ও অনভিজাত— এই দ্বিমুখী বাঙালি জীবনধারা অন্তত কিছুকালের জন্যও একত্রবদ্ধ হয়ে এক অখণ্ড বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল।

ঘ) বাঙালি জীবনে রামায়ণের প্রতিষ্ঠা ও মহাভারতের প্রতিষ্ঠার মধ্যে প্রায় শতাধিক বৎসরের ব্যবধান। মহাভারত-কাহিনী রামায়ণ-কাহিনীর মতো বাঙালি জীবনের ততটা ঘনিষ্ঠ নয়। তাই এই কাহিনীতে বাঙালি জীবনে খাপ খাইয়ে নিতে সময় লেগেছে। বাঙালি যুদ্ধপ্রিয় জাতি নয়, ক্ষত্রিয়-বীর্যের কাহিনিতে তার কৌতূহল থাকলেও নেশা নেই। শান্ত রসাশ্রিত স্নেহপ্রেমপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবনই তার পক্ষে সত্য বস্তু। রামায়ণেও রাম-রাবণের যুদ্ধ নয়, রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণ-ভরতের ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্য, সীতার পতিপ্রেম, হনুমানের প্রভুভক্তি প্রভৃতি গৃহধর্মই বাঙালির চিত্ত হরণ করেছিল। সেইজন্য রামায়ণের অনুবাদই হয়েছিল তার প্রাথমিক ও স্বাভাবিক কাজ।

কিন্তু মহাভারতে ক্ষত্রিয় রাষ্ট্র-ধর্মের কাছে গৃহধর্ম পরাজিত। এখানে উদ্ধত পৌরুষ, প্রচণ্ড আত্মাভিমান ও মর্যাদাবোধ ব্যক্তিজীবনের ঊর্ধ্বে উঠেছে, রাষ্ট্রজীবন ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ভুলিয়েছে, প্রেম ভুলিয়েছে, পুত্রশোককেও অগ্রাহ্য করিয়েছে। সমগ্র মহাভারত আসলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতত ও পরিণাম, যুদ্ধ ছাড়া এখানে প্রায় সব কথাই অপ্রধান। এই জাতীয় কাব্য যে হৃদয়ধর্মী বাঙালি জাতির কাছে প্রকৃতি বিরুদ্ধবোধে বহুকাল প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকবে, তা আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাই বোধ হয়, এক যুযুৎসু বিদেশী রাজপ্রতিনিধি পরাগল খাঁর কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্যই কবীন্দ্র-পরমেশ্বরকে বাংলা ভাষায় প্রথম মহাভারত-কাব্য অনুবাদ করতে হয়েছিল। সেও পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধের রচনা। কিন্তু মহাভারত কাব্যের পক্ষে বাংলার

মন্তব্য

লোকসমাজে সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হয়েছিল সপ্তদশ শতকে কাশীরাম দাসের প্রতিভার দাক্ষিণ্যেই।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন— ''রামায়ণ গার্হস্থ্য রসপ্রধান, ভক্তি-উদ্বেল, শান্ত জীবন পরিণামের কাহিনী। উহার সব সুর ছাপাইয়া পারিবারিক জীবনের বিয়োগবিধুর শোকোচ্ছ্বাস ও ঐশী মহিমার নিকট একান্ত আত্মনিবেদনের সুরটিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার চরিত্রের পরিকল্পনা ও কাব্যকৃতিও এই প্রধান সুরের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। মহাভারতের পরিসমাপ্তিতে একটি শান্ত নির্বেদ ও উদাসীন ত্যাগ বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

অনেক সমালোচকের মতে, বাঙালি যে মহাভারতের অনুবাদ করেছে, তার মূলে সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক কারণ নয়, ধর্মীয় কারণই বর্তমান। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম প্রচারই বাঙালিকে মহাভারত অনুবাদে প্রেরণা দিয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কৃষ্ণকেন্দ্রিক এবং মহাভারত কৃষ্ণলীলার আদি প্রামাণিক গ্রন্থ। একথা সত্য যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই মহাভারতের কেন্দ্রীয় ঘটনা এবং এই কাব্যের অঙ্গীরস বীররস, তবুও এতে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশও অল্প নয়। তাছাড়া বাঙালি মহাভারতের অঙ্গীরসকে বীররস থেকে ভক্তিরসে পরিবর্তিত করেই গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ আছে, ''কৃত্তিবাসে ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাব কাশীরামে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া ধর্মশাসিত জীনানুরাগকে একটি বৃহৎ স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে। বৃন্দাবনলীলার মিলিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য হইতে মহাভারতীয় কৃষ্ণে উত্তরণই বাঙালি মানস-চেতনার কৃত্তিবাস হইতে কাশীরামে অগ্রগতির নিয়ামক মানদণ্ড।''

১০.২। কাশীরাম দাসের কবিত্ব পরিচয়

কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদকাব্য 'ভারত পাঁচালী'র সূচনায় বেদব্যাসের বন্দনা করে তাঁর রচনা কাজে মনোযোগী হ'ন—

শ্লোকছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ।।'

অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ব্যাস মহাভারত যাতে সাধারণ লোকের বোধগম্য হ'য় এবং তার রসগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে যে কাশীরাম সচেতন ছিলেন তার

প্রমাণ নিজের বক্তব্যে— মন্তব্য

‘সর্বশাস্ত্র মধ্যে যার প্রধান গণন।

দেবগণ মধ্যে যথা দেব নারায়ণ।।”

‘নদনদীগণ যেন প্রবেশে সাগর।

সকল পুরাণ কথা ভারত ভিতর।।

অদেক কঠোর তবে ব্যাস মহামুনি।

রচিত বিচিত্র গ্রন্থ ভারত কাহিনি।।

শ্লোকচ্ছন্দে সংস্কৃত বিরচিলা ব্যাসে।

গীতিচ্ছন্দে কহি তাহা শুন অনায়াসে।।’

কাশীরামকৃত এই স্বীকারোক্তির পরে তাই কিছুতেই বলা যাবে না যে— কাশীরাম সংস্কৃত জানতেন না, কথক ঠাকুরদের কাছ থেকে মহাভারত শুনে কাব্য রচনা করেছেন, আসল ঘটনা হ’ল সংস্কৃত ভাষায় যথারীতি পাণ্ডিত্য ছিল কাশীরামের। উচ্চস্তরের পাণ্ডিত্য না থাকলে কোনভাবেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত ব্যাস মহাভারতের মত ঐরকম একটা কঠিন বিষয়কে-কাহিনি ও ভাবানুসারী সঙ্গতিতে ভাবানুবাদের মর্যাদা দান করা সম্ভব হোত না। মেদিনীপুরের আওয়াসগড়ের জমিদারবাড়ীতে আশ্রয়কালে পণ্ডিত ও কথকঠাকুরদের কাছ থেকে মহাভারতের গল্প শুনে কাশীরামের মহাভারত অনুবাদের যে জনশ্রুতি তা যথার্থ নয়। একটি বর্ণনায় মেলে—

‘শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।

অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার।।’

এখানে ‘শ্রুতমাত্র’-এর অর্থ শুনে শুনে নয়; এর প্রকৃত অর্থ হ’ল ‘‘আমি এমন কবিত্বশক্তি সম্পন্ন যে, যাহা শুনি তাহা অনায়াসে পয়রাদি ছন্দে প্রকাশ করিতে পরি” (মণীন্দ্রমোহন বসু-বাংলা সাহিত্য, ২য়)।

‘ভারত পাঁচালী’ পাঠ করলেই ধরা পড়ে, কাশীদাসী মহাভারতের চারপর্ব জুড়ে ভাষা ও বাক্য গঠনে সংস্কৃতানুগামীতা, তৎসম শব্দের গাম্ভীর্য ও অলঙ্কারধর্মের ক্ল্যাসিকতায় এক পণ্ডিত কবির কবি প্রতিভাই সুচিহ্নিত হয়। কৃত্তিবাসের মতো কাশীরামও মূলের যথাযথ অনুবাদ করেননি, ভাবানুবাদেই মনোযোগী হয়েছেন। তবে কাব্যের

মন্তব্য

কোন কোন জায়গায় আক্ষরিক অনুবাদ স্পষ্ট হয়েউঠেছে। আর্য মহাভারত—

'অর্থানামর্জনে দুঃখং বর্ধনে রক্ষণে তথা।
তেষাং হি বৈরিণো জ্ঞাতি বহ্নি তস্করপার্থিবাঃ।।'

কাশীরাম এর অনুবাদ করেছেন—

'উপার্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণে।
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরি রাজা-অগ্নি-চোর বন্ধুজন।।'

'ভারত-পাঁচালী'-র চারপর্ব জুড়ে এই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত হ'ল, ''কবি মূল সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনিকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন-অবশ্য প্রথম চারিপর্ব, যাহা তাঁহার রচনা বলিয়া ইদানীং গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী অন্যান্য পর্বে ক্রমেই সেই ক্লাসিক সংযম, ভাবগম্ভীর রচনারীতি ও মূলের নিপুণ অনুসরণ হ্রাস পাইয়াছে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)।

কাশীরাম কৃত ব্যাস মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেও বলা যায়, কাশীরাম পণ্ডিতশ্রেণির জন্য কাব্য পরিকল্পনা করেননি। সাধারণ মানুষের রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করার জন্য তত্ত্বদর্শন ও নীতিকথা জাতীয় বিষয়গুলিকে পরিহার করে প্রয়োজনীয় অংশের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। ''কবি যদিও সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, কোনও কোনও স্থলে মৌলিক গল্পও গ্রথিত করিয়াছেন (যেমন শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনি), তবু মূল মহাভারতীয় কাহিনির রস ইহাতে প্রায় কোথাও খর্ব হয় নাই। কৃত্তিবাসের রচনায় যেমন একটা সরল পাঁচালীর লক্ষণ আছে, কাশীরামের রচনা সেইরূপ পাঁচালী জাতীয় হইলেও, তাহার ভাষাভঙ্গিমায় ক্লাসিক তৎসম শব্দটা গ্রন্থননৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয়'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। অর্জুনের রূপবর্ণনায় কবি কাশীরামের কবিত্ব—

'অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।।

সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল। মন্তব্য

খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।।'

কিংবা দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণার রূপ বর্ণনা—

'অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু।

ঝলমল কুন্তল কমল-প্রিয়বন্ধু।।

সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর-রঙ্গিমা।

ভ্রূভঙ্গ অঙ্গন চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা।।'

কৃত্তিবাসের পাঁচালীর সারল্য হয়তো কাশীরামের এই বর্ণনায় মেলে না, হয়তো তৎসম শব্দসমৃদ্ধ ভাষার অপেক্ষাকৃত কাঠিন্য ও অল্প বিস্তর কৃত্রিমতায় বাঙালি হৃদয় সেভাবে জেগে ওঠেনি; তবু এত কথা জোর করে বলা যায়, বাঙালি হৃদয়ে ও সমাজে – কৃত্তিবাস ও কাশীরাম উভয় কবিতার প্রভাব প্রায় সমতুল। কাশীরামের এই তৎসম শব্দ বাহুল্য ও ধ্বনিঝঙ্কারের জন্য যুগধর্মই অনেকটা দায়ী। ''কিন্তু কাশীরাম যখন কাব্য রচনা আরম্ভ করেন, তাহার কিছু পূর্ব হইতে চৈতন্য প্রভাবে ফলে উত্তরাপথের আদর্শ, বিশেষত তৎসম শব্দ মধ্যযুগীয় গ্রামীণ বাংলা কাব্যচ্ছন্দকে বিশেষভাবে রূপান্তরিত করিতেছিলেন। কাশীরাম এই পর্বের কবি।... ক্লাসিক মহাকাব্য, বিশেষত পৌরাণিক যুগের মহাকাব্যের রচনায় এইরূপ একটা ঝঙ্কারমুখর শব্দ শৃঙ্খলার প্রয়োজন। কাশীরাম সেই জাতীয় কৃত্রিম কাব্যকলার অনুসরণ করিয়াছেন, এইরূপ কাব্যে যাহার প্রয়োগ অস্বীকার করা যায় না।'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। অর্থাৎ কাশীরামের ভাষা কৃত্তিবাসের মতো সরল না হলেও, বর্ণনা কুশলতায় কাব্যের গতি পুরোপুরি রক্ষিত। বলা যায়, কাশীদাসী মহাভারতের 'ভারত পাঁচালী'-তে পাঁচালির গ্রাম্যসুরের মধ্যে এসেছে ধ্রুপদী গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য। তা সত্ত্বেও শব্দ বিন্যাসের সহজ সরল স্বাভাবিকতার কারণে পাঠকের রসগ্রহণে কোন বাধার সৃষ্টি ঘটায় না। কাশীরামের বৈষ্ণব ভক্তির প্রগাঢ়তা ভাষাকে রসসাবলীল করে তুলতে সাহায্য করেছে। যেমন-

'কারণ করণ কর্তাদের দেব গদাধর।

আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।।'

মন্তব্য

এই বিষয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত হ'ল, ''সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিবাদ সমাজে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কাশীরামের রচনা হইতে তাহার ভুরি পরিমাণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)।

কাশীরাম পণ্ডিতদের জন্য মহাভারতের অনুবাদে হাত দেননি। বাদানুবাদের পথে যে স্বাধীন কবিত্ব শক্তির বিকাশ কবি ঘটিয়েছেন, তাতে প্রয়োজনীয় অংশগুলিও স্থান পেয়েছে। তাছাড়া চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভক্তির পথ ধরে বাঙালি সমাজ ও বাঙালিয়ানার প্রতিফলনে কাশীদাসী মহাভারত বাংলার জাতীয় কাব্যে পরিণত হয়েছে। দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার যে কলহ সভাপর্বে বর্ণিত তা সপ্তদশ শতাব্দীর দুই সতীনের কলহেরই ছবি—

'কৃষ্ণা বলে, নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি।।
কি আহার কি বিচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ।।'

এর উত্তরে হিড়িম্বার উত্তর ঃ

অকারণে পাঞ্চালি করিস অহঙ্কার।
পরে নিন্দা নাহি দেখ ছিদ্র আপনার।।'

রসের বিচারে বলতে হয়, কাশীদাসী মহাভারতে বিচিত্র রসের সমন্বয় ঘটেছে। বীররসের পাশাপাশি হাস্যরসের বর্ণনাতেও কাশীরাম অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। যুদ্ধের ব্যাপারে ভীমের যে পৌরুষত্ব বর্ণনা, বীররসের দৃষ্টান্ত হিসেবে তা যথেষ্ট উৎকৃষ্ট—

'মুখ তুলি বৃকোদর যেই দিকে চায়
পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়।।
সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্বত মন্দর।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর।।'

অন্যদিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈন্যদলের পলায়নের বর্ণনায় কারুণ্যের আধারে কৌতুক

রসের অবাধ উৎসার ঘটেছে— মন্তব্য

‘উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল।

পথাপথ নাহি জ্ঞান যেদিকে পাইল।।

আড়ে ওড়ে ঝাড়ে ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া।

জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া।।’

‘‘শিল্পাদর্শের বিচারে কাশীরাম দাস মধ্যযুগীয় অনুবাদ সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি বলিয়া উচিত মর্যাদা পাইবেন।... তাঁহার রচনারীতি বিশেষ প্রশংসনীয়’’ (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। রচনারীতির ক্ষেত্রে কাশীরাম পয়ার ছন্দেরই অধিক ব্যবহারে ঘটিয়েছেন। অবশ্য কিছু কিছু ত্রিপদীর ব্যবহারও কবির রচনাকৌশলেরই পরিচয় বহন করেছে। কবি প্রাচীন অলঙ্কার ব্যবহারের প্রতিই অধিক মনোযোগী হয়েছেন। তবে অন্ত্যানুপ্রাসে কবির নৈপুণ্য প্রতিষ্ঠিত। যেমন—

‘মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র মন্ডলে।

দানবের মধ্যে যেন দেব আখন্ডলে।।’

চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে কাশীরাম দাস সন্দেহাতীভাবে কৃতিবাসকে অতিক্রম করে গেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ‘‘মহাভারতে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, কুন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি নারী আপন আপন স্বতন্ত্র চরিত্র-মহিমায় সমুজ্জ্বল। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও রাবণ জীবন্ত চরিত্র হইলেও ইহারা ব্যক্তিত্বদ্যোতক গুণ অপেক্ষা আদর্শনিষ্ঠার বিভিন্ন বিকাশের দ্বারা অধিকতর চিহ্নিত’’ (বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, প্রথম খণ্ড ঃ আদি ও মধ্যযুগ)। মহাভারতের পরিসমাপ্তিতে শান্ত উদাসীন ত্যাগ-বৈরাগ্যের সুর প্রবাহিত হলেও এই মহাকাব্যে নীতি অনুসরণের পাশাপাশি কুণ্ঠাহীন জীবনপ্রীতি ও রাজনীতি অনুসারী কুটিল ও ছলনাময় আচরণের অসাধারণ বাস্তব সমন্বয় লক্ষ্য করা হয়। ‘‘সে যাই হোক, বাংলা ‘রামায়ণ’ সাহিত্যে কৃত্তিবাস যেমন, তেমন ‘মহাভারত’-সাহিত্যে কাশীদাস কেবল এক শ্রেষ্ঠ কবি নন, সামগ্রিক একটা ঐতিহ্যের প্রতিভূ। কিঞ্চিধিক তিন পর্ব মাত্র কাব্য রচনা করেও অষ্টাদশ পর্ব ‘মহাভারত’ রচনার অমর গৌররের তিনি অধিকারী হয়েছেন। ভারত রসবাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার খাতটি আপন হাতের রচনা। বাংলা ভাষার বাঙালীর মহাভারত রচনার অজস্র বিচিত্র প্রয়াসের প্রাণসূত্র একটিমাত্র

মন্তব্য

ঐক্যের বন্ধনে বিধৃত; আর সেই একক-আদর্শের স্রষ্টা কবি কাশীরাম দাস" (শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)। পরবর্তীক্ষেত্রে আরো অনেক কবি মহাভারতের অনুবাদে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু কাশীদাসী মহাভারতের বিপুল জনপ্রিয়তার কাছে সেগুলি শুধুই নামমাত্র, তার বেশী নয়।

১০.৩। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রামাণিকতা

কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরামের মহাভারত— এই দুই মহাগ্রন্থ যথাক্রমে পাঁচ শ' ও তিন শ' বছর ধরে বাঙালির জনজীবন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। কিন্তু এই দুই গ্রন্থের কতটুকু কৃত্তিবাস বা কাশীরামের রচনা তা বলা কঠিন। পুঁথি লেখক ও গায়েনদের হস্তাবলেপে দুটি কাব্যেই প্রচুর প্রক্ষিপ্ত রচনা অনুপ্রবেশ করেছে— দুটি গ্রন্থের ভাষাই আদ্যন্ত পরিমার্জিত ও আধুনিক। তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, যতদিন না এই দুই গ্রন্থের প্রামাণ্য পুঁথি আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততদিন এদের সম্পর্কে আলেচনা নিষ্ফল। বলা বাহুল্য, সাহিত্য জগতে এই মতের কোনই দাম নেই। ব্যক্তি-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই মত প্রযোজ্য, কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সত্যকার ব্যক্তিনির্ভর সাহিত্য নয়, প্রধানত জনসাহিত্য। জনসাহিত্যের অধিকাংশই হয় জনগণের রচনা। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণ মহাকাব্য দুটিও কোন ব্যক্তি-বিশেষের রচনা নয়, এমনকি এক যুগেও সৃষ্টি নয়। আসলে মৃত কাব্যই প্রাচীন ভাষার শবাধারে 'মমি' হয়ে বিরাজ করে; কিন্তু যে সব কাব্য পাঠক জীবনের সহচর হয়ে বেঁচে আছে, যুগে যুগে তাদের ভাষা-কলেবর পরিবর্তত হয়।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাহিনি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কবি আর্য রামায়ণের বিশাল ও ব্যাপক কাহিনির মহাকাব্যোচিত বেগশীলতার মর্যাদা রক্ষা করতে সমর্থ হননি। বহু ক্ষেত্রেই তিনি মূল কাহিনিকে সঙ্কুচিত করে নিয়েছেন, বাল্মীকির নিসর্গ বর্ণনার অপরূপ মাধুরী প্রায়শই জাতিকুল হারিয়ে ফেলেছে।

তবুও তাঁর রামায়ণ পাঁচালির মধ্যে কয়েকটি কাহিনি আছে যাতে মহাকাব্যের বিশালতা অপেক্ষা গীতিকাব্যের অন্তর্লীন গভীরতা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। কৃত্তিবসের

সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যেও আর্য রামায়ণের বিপুল ব্যপ্তি, উচ্চ মহনীয়তা, অমানুষিক বর্বরতা— কোনটিই মহাকাব্যের বিশালতাকে মর্যাদা দিতে পারে নি। কৃত্তিবাসের যামচন্দ্র প্রেমের দেবতা, ভক্তপ্রাণ, অশ্রুজলে আবেগব্যাকুল; লক্ষ্মণ অপরিণামদর্শী উদ্ধত; স্ত্রৈণ দশরথ অসহায় ক্লীব মাত্র। রাক্ষস রাবণ একাধারে বর্বর, দুর্বিনীত, অপরদিকে প্রচ্ছন্ন ভক্তির গঙ্গোদকে পরিস্নাত।

উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের রামকাহিনি কৃত্তিবাসের হাতে মহাকাব্যের গগনস্পর্শী আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যেন বাংলার অপরিসর চণ্ডীমণ্ডপে স্থাপিত হয়েছে। রসনিষ্পত্তিতে অবশ্য ফুলিয়ার পণ্ডিত আর্য আদর্শেরই অনুসরণ করেছেন, যদিও মূল রামায়ণের বীররস বর্ণনায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্য রঙ্গরসে কৃত্তিবাস বাংলা সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান দাবি করতে পারেন। আলঙ্করিক নিপুণতা, বাগ্‌ভঙ্গীর তির্যকতা এবং সর্বোপরি পৌরাণিক বাঁধা পথের আলঙ্করিক কৌশলের সঙ্গে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচিত্র মিশ্রিত হয়ে কবির বক্তব্যকে তীক্ষ্ণতর করেছে।

কাশীদাসী মহাভারত

কাশীরামের নামে প্রচলিত মহাভারতের গোড়ার দিকের চারটি পর্ব ব্যতীত অবশিষ্ট বিপুলায়তন রচনা তাঁর নয়। কৃত্তিবাসের রচনায় যেমন একটা সরল পাঁচালির লক্ষণ আছে, কাশীরামের রচনা সেরকম হলেও তাঁর ভাষাভঙ্গিমায় ক্লাসিক তৎসম শব্দের গ্রন্থনৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য। আগেই বলা হয়েছে, চৈতন্যদেবের ভক্তির আলোকে বাংলা মহাভারত নূতনতর রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাই কি কাহিনিগ্রন্থনে, কি চরিত্রসৃষ্টিতে, কি রসবিচারে বাংলা রামায়ণের মতো বাংলা মহাভারতও মূল আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মধ্যযুগীয় বাঙালি জীবনের অনুবর্তন করেছে।

কৃষ্ণভক্তিকে জীবনের কেন্দ্রবন্দু করায় মূল মহাভারতের রাজধর্মানুশাসন পর্ব, আপদ্ধর্ম পর্ব ও আনুশাসনিক পর্ব একেবারে বর্জিত হয়েছে। ভীষ্মদ্রোণাদি বড় বড় বীর হয়েছে ভগবদ্-ইচ্ছার যন্ত্র বা উপলক্ষ্য মাত্র। ভক্তির আলোকে পাণ্ডবদের মধুরতর দেখালেও তাঁরা প্রকৃতপক্ষে হয়ে পড়েছেন কৃষ্ণমুখাপেক্ষী নিস্তেজ বৈষ্ণব। সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হয়েছে দ্রৌপদীর। মূল মহাভারতের পঞ্চপতি-গর্বিতা বজ্রাগ্নিরূপিনী দ্রৌপদী কাশীদাসী মহাভারতে হয়ে পড়েছেন অবলা ও ব্যাকুলা বাঙালি বধূ।

মন্তব্য

১০.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। কাশীরাম দাসের মহাভারত অনুবাদের জনশ্রুতিমূলক বর্ণনায় ''শ্রুতমাত্র'' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী।

২। কৃত্তিবাসের পাঁচালির সারল্য কাশীরাম দাসের বর্ণনায় মেলেনা,— উক্তিটি তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৩। কাশীরাম দাস মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি— উক্তিটির তাৎপর্য উল্লেখ করো।

৪। কাব্যগত আবেদনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের তুলনা করো।

৫। কাশীরামদাসের কবিত্ব পরিচয় সম্পর্কে যা জানো লেখ।

৬। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রামাণিকতা উল্লেখ করো।

১০.৫। সহায়ক পঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - দেবেশ আচার্য।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীমন্ত কুমার জানা।

একক - ১১ কাশীদাসী মহাভারতে শিল্পরীতি, বাঙালিয়ানার অভাব ও পরবর্তী বাংলা কাব্য।

বিন্যাসক্রম —

১১.১। কাশীদাসী মহাভারতে শিল্পরীতি

১১.২। কাশীদাসী মহাভারতে বাঙালিয়ানার অভাব

১৩.৩। কাশীরাম দাস ও পরবর্তী বাংলা কাব্য

১১.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১১.৫। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১১.১। কাশীদাসী মহাভারতে শিল্পরীতি

কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারতে পৌরাণিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন। তাঁর রচনারীতিতে সংস্কৃত মহাভারতের তৎসম বহুল ক্লাসিক ও রীতির শব্দ প্রয়োগ বেশি। তাই কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো কাশীদাসী মহাভারত সামগ্রিকভাবে বাঙালি ঘরের কাহিনী হয়ে ওঠেনি। তবে একথা স্বীকার্য যে বাঙালি চরিত্রের অনুগ করেই তিনি মহাভারতকে সহজবোধ্য ও সাবলীল করে তোলেন। বাঙালির চরিত্র বৈশিষ্ট্য, জীবনচর্চা, ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনা তাঁর সৃষ্ট অনেক চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। ভীম ও অর্জুন মূল মহাভারতের মতো ক্ষাত্রতেজে দীপ্ত নয়। ক্রোধে, অভিমানে, আনন্দে ও হতাশায় তাঁরা বাঙালির সমধর্মী হয়ে ওঠেন। মহাভারতের দু' এক জায়গায় তিনি বাঙালি ঘরের জীবনধর্মকে দু'একটি কথায় সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ সভাপর্বে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার কলহের মধ্যে বাঙালি সমাজের দুই সতীনের কলহের ছাপ পড়েছে এবং সেই বর্ণনা চমৎকার কৌতুক রসসিক্ত, বেশ উপভোগ্য ও প্রশংসনীয়।

শিল্পরীতিতে কাশীরাম দাস ক্লাসিক আদর্শ অনুসরণ করে কাব্যের মধ্যে পৌরাণিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সমর্থন হয়েছেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনায় তিনি সংস্কৃত বহুল শব্দ প্রয়োগ করে ঘন পিনদ্ধ বাক্‌বিন্যাসে ক্লাসিক সৌন্দর্যের সমুন্নতি ঘটিয়েছেন—

সহস্র মস্তক শোভে সহস্র নয়ন।

সহস্র মুকুটমণি কিরীট ভূষণ।

সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল।।
বিবিদ আয়ুধ ধরে সহস্রেক করে।
সহস্র চররে শোভে কত শশধরে।।
সহস্র সহস্র হেন সূর্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি শোভিত হৃদয়।।

এককথায় মহাভারতীয় রস ও মহকাব্যিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্য কাশীরাম দাস ক্লাসিক আদর্শ অনুসরণ করেছেন সুপরিমিত ও সুবিহিত তৎসব শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ করে। 'অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা', 'মহাবীর্য যেন সূর্য জলদে আবৃত', 'শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি শোভিত হৃদয়' এবং 'ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস' প্রভৃতি পংক্তিগুলিতে ক্লাসিক সাহিত্যের সুমহান অটল গাম্ভীর্যের সৌন্দর্যদ্যুতি উঠেছে।

১১.২। কাশীদাসী মহাভারতে বাঙালিয়ানার অভাব

পূর্বেই বলা হয়েছে কাশীদাসী মহাভারতে কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো বাঙালিয়ানা নেই। গ্রামীণ সরলতা ও বাঙালির পারিবারিক জীবনের সঙ্গে কাশীরাম দাসের মহাভারত অবিষ্ট নয়। এর মূল্য আলাদা। এই গ্রন্থ কেবল সংস্কৃত না জানা বাঙালির রসপিপাসা চরিতার্থ করেনি, মানবজীবনের সমুচ্চ আদর্শে কাশীরাম দাস বাঙালির মানসপ্রকৃতিকে গঠন করতে প্রয়াসী ছিলেন। বৈষ্ণব ভক্ত কাশীরাম দাস বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে মহাভারতের মহানায়করূপে দেখে তাঁর পদাশ্রয়ে নিজেকে নিবেদন করেছেন। মহাভারতের বহু জায়গায় কবির প্রগাঢ় বৈষ্ণবভক্তি ও ভাবুকতার অভিব্যক্তি ঘটেছে। তিনি বার বার লিখেছেন—

কারণ করণ কর্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।।

যাহোক, সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে কাশীরাম দাস গল্পরস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শ, ধর্মপ্রাণতা ও নৈতিক মূল্যবোধ ও ঈশ্বর ভক্তির আদর্শ প্রচারে সচেষ্ট হয়েছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে অতিথি সেবা, জীবে নয়া, পরোপকারিতা ও স্বার্থত্যাগের মহিমা প্রচার করে উদার উন্নত মানবধর্মে কবি

বাঙালি জাতিকে মনুষ্যত্বের রাজসিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী। মন্তব্য

সর্বোপরি কাশীদাসী মহাভারত বাঙালিকে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার বিপুল শক্তি ও অনুপ্রেরণা দেয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো এই গ্রন্থ কেবল মাত্র করুণরসের নির্ঝর নয়। বাঙালির ধ্যান-ধারণা ও বাব কল্পনার সঙ্গে কাশীরাম দাস মহাবারতীয়-ভাবাদর্শকে যথাসম্ভব মিলিয়ে দিয়েছেন। কঠিন সাধনায় তিনি অমৃত সমান মহাভারতের বাণীকে বাঙালির হৃদয় দ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। মর্তলোক ও স্বর্গলোকের সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে কাশীরামের কাব্যে। মহাভরতের অমৃতবারী বুকে ভরে নিয়ে বাঙালি জীবনের রাঙামাটির পথ দিয়ে অমৃতলোকে যাবার জন্য অগ্রসর হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতোই ধনী দরিদ্র সকলের ঘরে কাশীদাসী মহাভারতের সমান সমাদর। বাঙালি জীবনে আজ পর্যন্ত কত পরিবর্তন হয়ে গেল। সভ্যতার রূপও পাল্টে পাল্টে যাচ্চে ক্রমাগত। কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারতের কাব্যরসধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় বাঙালির অন্তজীবনে কুলুকুলু নদে প্রবাহিত। কাশীরামের মহাভারত বাঙালি জনসাধারণের জীবনগীতা। কাশীরামের মহাভারত বাঙালি জীবনের একটি বড়ো ট্রাডিশন বা ঐতিহ্য। মধুসূদন যথার্থই বলেছেন যে কাশীরাম দাস— ভারতরসের স্রোত অনিয়াছ তুমি। জুড়াতে গৌড়ের তৃষ্ণা সে বিমল জলে।' আর বাঙালি জাতিকে মহাভারতের অমৃতবাণী দান করার জন্য 'হে কাশী কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।

১১.৩। কাশীরাম দাস ও পরবর্তী বাংলা কাব্য

কাশীরাম দাসের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা কাব্যভাষায় ও বর্ণনাভঙ্গিতে বেশ একটা স্বাভাবিকতা ছিল। সে যুগের কবিরা সহজ মাধুর্যে ও ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে তাদের ভাব প্রকাশ করতেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনায় আমরা এরূপ প্রাণের কথা সহজ অনাড়ম্বরভাবে প্রকাশ পেতে দেখি। কিন্তু কাশীরাম দাসের পরবর্তীকালে বাংলা কবিতায় সেই সহজ, স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। অলংকারের বাহুল্যে, শব্দের ছটায় ও ঐশ্বর্যে, উপমা অনুপ্রাস প্রভৃতির আতিশয্যে বাংলা কবিতার সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে যায়। কাশীরাম দাস সেই দুই যুগের মধ্যবর্তী কবি। তাঁর রচনায় একদিকে যেমন মুকুন্দরাম প্রভৃতির স্বাভাবিকতা আছে, তেমন আবার পরবর্তীকালের মার্জিত ভাষা এবং সুন্দর অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগও আছে। এককথায়, কাশীরাম দাসের মহাভারতে পূর্ববর্তী যুগের নিরলংকার স্বভাব সৌন্দর্য ও পরবর্তী ভারতচন্দ্রীয় যুগের

মন্তব্য অলংকারের ঐশ্বর্যদীপ্ত সৌন্দর্যের এক অপরূপ সমন্বয় সাধিত হয়েছে। একদিকে অতীত যুগের তিনি ধারক ও বাহক, অপর দিকে পরবর্তী যুগের আভাসটুকু তাঁর মধ্যে অভিব্যক্ত।

মহাকাব্য মহাভারতকে মহাসমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মহাসমুদ্র যেমন রত্নাকর মহাভারতও তেমনি রত্নাকর। মহাসমুদ্রে থেকে ডুবুরী যেমন মণিমুক্তা আহরণ করে আনেন, তেমনি মহাভারত থেকে কত কবি যে তাঁদের কাব্য রচনার উপকরণ, কত নাট্যকার যে তাঁদের নাট্যরচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, কত বীর যে তাঁদের বীরত্বের অনুপ্রেরণা, কত মানুষ যে তাদের সত্যনিষ্ঠার, ধর্মপরায়ণতার ও ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতির আদর্শ লাভ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

লোকে বলে— 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।' অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই, এমন কোনো বস্তু ভারতবর্ষে নেই। মহাভারতের গল্প কাহিনি নীতি-উপদেশ ভারবর্ষে লোকশিক্ষার প্রধান সম্বল। মহাভারত কাব্যটি সমগ্র আর্যজাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক রূপে বিরাজমান। মহাভারত কাব্যটি ভারতবর্ষে না থাকলে মানুষের চিত্ত সুকুমার ভাবধারার অবাবে শুকিয়ে যেতে। মহাভারত অসংখ্যা ভাবধারা প্রবাহিত করে ভারতবর্ষের নরনারীর ভাবজীবনকে পরিপুষ্ট করে তুলছে। তাঁদের আত্মার ক্ষুধা মিটাচ্ছে। মহাভারত ভারতবাসীর জীবন গড়ে তুলছে। মহাভারত ভারতবাসীর প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি। কত গল্প, কত কাহিনি, কত নীতিকথা সহস্রভাবে সহস্রখাতে প্রবাহিত হয়ে ভারতের সাহিত্যকে চিরশ্যামল করে রেখেছে এবং জাতীয় জীবনে তা আবহমানকাল লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়ে রেখেছে। মহাভারত তাই ভারতীয় সাহিত্যের তথা জীবনের প্রধান আশ্রয়। বিশালতায় এবং অজস্র রস পরিবেশনে মহাভারত হিমালয় সদৃশ। কাশীরাম দাস সেই হিমালয় সদৃশ মহাকাব্যকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের তথা বাঙালিজাতির জীবনের উন্নতি ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা করে গেছেন বলে তিনি চিরকাল বাঙালির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র থাকবেন।

১১.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। কাশীরাম দাস তাঁর অনুদিত কাব্যে কোন রীতির শব্দ বহুল প্রয়োগ করেছেন?

২। কাশীরাম দাসের মহাভারতে কোন কোন রস পরিলক্ষিত হয়?

৩। কাশীদাসী মহাভারতের শিল্পরীতি উল্লেখ করো?

৪। কাশীদাসী মহাভারতে বাঙালিয়ানা নেই বললেই চলে উল্লেখ করো?

৫। কাশীরাম দাস ও পরবর্তী বাংলা কাব্যে প্রভাব আলোচনা করো? মন্তব্য

১১.৬। সহায়ক পঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - দেবেশ আচার্য।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীমন্ত কুমার জানা।

একক - ১২ মুসলিম সাহিত্য, সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের কৃতিত্ব, সপ্তদশ শতকের চট্টগ্রাম রোসাঙ্গ রাজসভার দরবারি সাহিত্য।

বিন্যাসক্রম -

১২.১। মুসলিম সাহিত্য

১২.২। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের কৃতিত্ব

১২.৩। সপ্তদশ শতাব্দীর চট্টগ্রামের রোসাঙের দরবারি সাহিত্য

১২.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১২.৫। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১২.১। মুসলিম সাহিত্য

রোসাঙ রাজসভার দুই খ্যাতিমান কবি দৌলত কাজী ও আলাওল ছাড়াও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইসলামি ধর্মভাবনা বা সুফি ভাবনাকে কেন্দ্র করে বহু কবি সাহিত্য রচনা করেছেন। এই সব সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে চরিতসাহিত্য, শাস্ত্র ও ধর্মসাহিত্য, পীরমহিমা ও জঙ্গনামা। অখণ্ড বঙ্গে সেইসব রচিত সাহিত্যগুলি সবই যে কবিত্বের নিরিখে উঁচুমানের, তা বোধহয় বলা যাবে না; কিন্তু মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে যে সব সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেছিলেন সেইসব সাহিত্যগুলির অনেকগুলিই সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। মধ্যযুগে হোসেন শাহ-র মতো সাহিত্য ও সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তির প্রভাব এই সাহিত্য রচনায় যে প্রেরণা জাগিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১২.২। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের কৃতিত্ব

সৃষ্টিকালে থেকেই বাংলা সাহিত্য দেবনির্ভর। দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন প্রসঙ্গ২ অবলম্বন করে কাব্য রচনার ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে মধ্যযুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। এই ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য ধারায় প্রথম ব্যতিক্রম ঘটল মুসলমান কবিদের রচনায়। অবিমিশ্র প্রেমকাহিনী নিয়ে প্রথম বংলা কাব্য রচনার সম্মান সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদেরই প্রাপ্য। ডঃ সুকুমার সেন তাই মন্তব্য করেছেন, ‘‘মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদিগকে এক নতুন সাহিত্যিক যুগের স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করিলে কিছুমাত্র অন্যায়

হয় না।" (ইসলামী বাংলা সাহিত্য)। মন্তব্য

সপ্তদশ শতাব্দীর এই মুসলমান কবিদের রোমান্টিক বাংলা কাব্যরচনার প্রেরণাস্থল ছিল আরাকান বৌদ্ধ রাজসভা। আসলে এই রাজসভার অধিকাংশ উচ্চপদস্থ পাত্রমিত্রই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী এবং ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমান। আরাকান রাজারা তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং কবিদের কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেছিলেন।

স্বভাবতই বিদ্যাসুন্দরের মতো প্রণয়কাহিনি যাতে দেবতার ভূমিকা যৎসামান্য তার দিকেই দৃষ্টি পড়েছিল মুসলমান শাসনকর্তাদের। সর্বাপেক্ষা পুরনো সে লৌকিক প্রণয় কাব্য বাংলা ভাষায় পাওয়া গেছে তা গৌড়ের রাজা হোসেন শাহ'র পুত্র ফিরোজ শাহ-র নির্দেশে কবি দ্বিজ শ্রীধর লিখেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কাব্যের ভনিতায় 'পেরোজ সাহা'র উল্লেখ আছে। কাব্যটি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না কারণ মাত্র দুটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালেও এক মুসলমান কবির লেখা বিদ্যাসন্দুর কাব্য পাওয়া গেছে।

মুসলমান কবির লেখা প্রথম যে বিদ্যাসন্দুর কাব্যটি (পাঞ্চালিকা) খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে সেটি সাবিরিদ খানের রচনা। সাবিরিদ খান কোন সংস্কৃত কাব্য অনুসরণ করে কাব্যটি লিখেছিলেন কারণ কাব্যের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত আছে। শুধু সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাতেই তাঁর জ্ঞান ছিল তা নয় বাংলা কাব্যকলায় তাঁর অধিকার ছিল বিদ্যার রূপ বর্ণনায় তা প্রকাশ পেয়েছে—

'বালেন্দু জিনিয়া ভাল সীমন্ত উজ্জ্বল
বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর যুগল।'

গৌড় দরবারকে আশ্রয় করে যে লৌকিক প্রণয় কাব্যের বীজ উপ্ত হয়েছিল, তা উত্তর পূর্ব ও পূর্ববঙ্গ অঞ্চলের মুসলমান দরবার থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল আরাকান রাজসভায়। এই আরাকান রোসাঙ্গ রাজসভাতেই বাংলা সাহিত্যের দুই শক্তিশালী মুসলমান কবির আত্মপ্রকাশ। আরাকানের রাজা শ্রীসুধমা'র রাজসভাকবি ছিলেন দৌলত কাজী। আরাকানের সমর-সচিব আশরাফ খানের উৎসাহে তিনি লৌকিক বিদ্যাসুন্দর কাব্য অবলম্বন করে যে কাব্য রচনা শুরু করেন তার নাম সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী।' গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। শ্রী সুধমার রাজত্বকাল ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং দৌলত কাজীর কাব্যরচনার নিম্নতম সীমা ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ।

মন্তব্য

পশ্চিমদেশের গুণিদের মুখে শোনা গাওয়ারি ও ঠেঠখোট্টা ভাষায় রচিত কাহিনির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন দৌলত। মিঁয়া সাধনের লোর চন্দার কাহনীই তাঁকে কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

দৌলত কাজী যে শক্তিশালী কবি ছিলেন তা তাঁর এই অসমাপ্ত কাব্যটি থেকেই বোঝা যায়। কবি সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা— তিন ভাষাতেই ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। ডঃ এনামুল হক বলেছেন, ''কবি অল্প বয়সে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।'' তাই কাব্যের প্রসাধনকলায় ও বর্ণাঢ্য বর্ণনায় অনেক সময়েই জয়দেব, কালিদাস ও বিদ্যাপতির শরণাপন্ন হয়েছেন দৌলত। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মিশেছিল দৌলতের কবি প্রতিভা। তাই কবির বারমাস্যাও প্রচলিত কাব্যের মত প্রাণহীন বা গদ্যময় নয়। নায়িকার বেদনা যেন বিশ্বপ্রকৃতির বেদনায় লীন হয়ে গেছে—

''মালিনী কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনে বাসহি বিধি ভেল মোর।''

মনে পড়ে যায় বিদ্যাপতির সেই বিখ্যাত পদটি—

''হে -- আমার দুখের গাহি ওর''। অলংকার প্রয়োগেও কবি কালিদাসকে অনুসরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ও অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন ''কবি যে গভীর মনোযোগ সহ কালিদাস পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'' কিন্তু কাব্যটি শেষ করার আগেই দৌলত কাজীর মৃত্যু হয়েছিল।

এর বেশ কয়েক বছর বাদে রাজা চন্দ্র সুধমার মন্ত্রী সোলেমানের অনুরোধে কবি সৈয়দ আলাওল কাব্যটি সমাপ্ত করেন। আলাওল পণ্ডিত ও গুণী ছিলেন। আরবী ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দীতে তাঁর অধিকার ছিল। সংগীত ও নাট্যকলাতে তাঁর দখল ছিল। দৌলিত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য তিনি সমাপ্ত করেন ১৬৫৮ সালের কাছাকাছি সময়ে। এই সময়েই তিনি 'তোহফা' এবং 'হপ্ত পয়কর' রচনা করেন।

আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী পাঞ্চালী'। জায়সীর 'পদ্মাবতি' কাব্যের অনুসরণে তিনি এ কাব্য রচনা করেন। যদিও আলাওল এ কাব্যের যথাযথ অনুবাদ করেননি। কখনো তাঁর অনুবাদ আক্ষরিক, কখনো ভাবানুগত, কখনো বা স্বাধীন। পদ্মাবতীতে ১১টি পদ আছে যা আলাওলের মৌলিক রচনা। জায়সীর কাব্যের দীর্ঘ অসংগত বিরহ বর্ণনা বাদ দিয়েছেন আলাওল। কিন্তু গৌণ চরিত্রগুলিকেও স্পষ্ট করে

তুলে কাব্যটিতে রস পরিবর্ধিত করেছেন। আলাওল সুফী সাধক ছিলেন। তাই পদ্মাবতীর মন্তব্য
স্থানে স্থানে সুফী প্রেমসাধনার গভীর রস সমৃদ্ধ বাণী শোনা গেছে—

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাবি বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ।।

পুঁথি পাঠের দুষ্টতায় অল্পশিক্ষিত লিপি

কারদের হাতে পড়ে এই পদ্মাবতী কাব্যের প্রচুর বিকৃতি ঘটেছে। তাই ছাপা সংস্করণও ভুলে ভরা। তবু তারই মধ্য থেকে বিচারে নিঃসন্দেহে সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রণয়কাব্য পদ্মাবতী, কবি, আলাওলা।

'পদ্মাবতী'র রচনা সমাপ্তিকাল আনুমানিক ১৬৫৯। এরপর আরাকান রাজসভার প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তিনি আর একটি কাব্য রচনা করেন— 'সয়ফুলমুলুক বদিউজুমাল'। আরব্য উপন্যাসের প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। বইটি দুই তৃতীয়াংশ রচনা করার পর মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হয় এবং রাজনৈতিক কারণে তিনি বন্দী হন। দীর্ঘ নয় বছর পরে সৈয়দ মুসার অনুরোধে আলাওল কাব্যটি সমাপ্ত করেন। প্রথম অংশের তুলনায় শেষাংশ নিরেশ।

১৬৬৩-৬৪ তে লেখা আলাওলের 'তোহফা' গ্রন্থটি সুফী ধর্মগ্রন্থ। ইউসুফ রচিত ফরাসী গ্রন্থের অনুবাদ।

আলাওল 'হপ্ত পয়কর' গ্রন্থটি লিখেছিলেন সম্ভবত শাহ সুজার রোসাঙ্গ আগমনের পর। সুতরাং রচনা সমাপ্তিকাল ১৬৬০ ধরা যায়। নিজমীর রচিত 'হপ্তপৈকর' থেকেই কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন আলাওল।

আলাওলের ষষ্ঠ ও শেষ রচনা 'সেকেন্দর নামা'। এটিও নিজামীর লেখা ফরাসী কাব্য 'ইসকন্দর নামা'-র অনুবাদ। আলোকজান্দারের বিজয় অভিযান সম্পর্কে যে সব কাহিনি প্রচলিত ছিল তা-ই এই কাজের বিষয়। ১৬৭১ খ্রীঃ মজলিস নবরাজের নির্দেশে এ কাব্য লিখেছিলেন— আলাওল সেকেন্দারনামায় আলাওলের কবিত্বের দীপ্তি ম্লান হয়ে এসেছিল তাই গ্রন্থটি একেবারেই বর্ণনাত্মক।

আলাওল আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে মনে করেন সমালোচকেরা। যেমন- 'চন্দ্রাবতী' নামক খণ্ডিত পুঁথিতে 'কোরেশী মাগন' ভণিতা দেখে অনেকে মনে

মন্তব্য

করেন এটি মাগন ঠাকুরের প্রসঙ্গ। পুঁথিটি খণ্ডিত, তাই বিশেষ কিছুই জানার উপায় নেই।

অপর এক মুসলমান কবি সৈয়দ সুলতান। এঁর লেখা দুটি মসুলমান-ধর্মগ্রন্থের নাম জ্ঞান প্রদীপ ও নবীবংশ। জ্ঞান প্রদীপ তান্ত্রিক যোগ বিষয়ক নিবন্ধ। নবীকংশ সংস্কৃত হরিবংশের অনুসরণে লেখা গ্রন্থ, সৈয়দ সুলতানের দীক্ষা গুরু ছিলেন শাহ হোসেন এবং শিক্ষাগুরু শাহ মহম্মদ। সুফী ও যোগী সাধক সৈয়দ সুলতানের কবিত্বের ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পদাবলীতে। এই পদাবলী অনেকটা চর্যাগীতির মতো সাংকেতিক ঢঙে লেখা।

মহম্মদখান রচিত 'মুক্তাল হোসেন' কারবালার যুদ্ধকাহিনী বিষয়ক আরবী গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদের অনুবাদ। লেখক কাব্যে যে বংশ পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে অনুমান করা হয় তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির আদর চলে গিয়েছিল। এর কারণ আরাকান রাজ্য এর বিশৃঙ্খলা ও রাজদরবারে বাঙালি মুসলমানের ক্ষমতালোপ। অন্যান্য মুসলমান কবিদের কাব্য কালের প্রবাহে বিলীন হলেও দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল— এই দুই মুসলমান কবির নাম চিরকাল বাঙালী স্মরণে রাখবে। কারণ মধ্যযুগের পাঁচালী প্রবাহে এঁরাই রোমান্টিকতার ভগীরথ।

১২.৩। সপ্তদশ শতাব্দীর চট্টগ্রামের রোসাঙের দরবারি সাহিত্য

সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রামের প্রত্যন্তে আরাকান বা রোসাঙের মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্যে কাব্য রসাস্বাদনের যে নূতন ধারা যোজনা করলেন, আমাদের সৃষ্ট ইতিহাসের মূল প্রবাহ থেকে তা স্বতন্ত্র। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের আবির্ভাব মোটামুটি ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে তুর্কি বিজয়ের কাল থেকে। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝিসময়ে চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার পর থেকে মগের দেশে বাঙালির সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ নিবিড় এবং অবারিত হয়ে ওঠে। স্বভাবতই ভৌগৌলিক ও রাজনৈতিক কারণে সেই সংস্কৃতি বৃহত্তর বঙ্গভূমির প্রচলিত ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতকে রোসাঙ অঞ্চলে উদ্ভূত নবীন সাহিত্য সেই স্বতন্ত্র ঐতিহ্যেরই উজ্জ্বলতম প্রকাশ।

ইসলামি সাহিত্যের মুখ্য দুটি ধারা। একটি ধর্ম বিষয়, আর একটি ধর্মনিরপেক্ষ—

অনাবিল মানবিক প্রণয়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ রোমান্টিক গাথা এবং মর্মস্পর্শী গীতি সাহিত্য। সপ্তদশ শতকে রচিত ইসলামি বাংলা কাব্যের অনেক স্থলেই হিন্দি প্রেম কাহিনির গভীর সুফি মতাদর্শের যোজনা করা হয়েছে।

ইদানীং কালে দু-একটি ইসলামি বাংলা কাব্যের সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে, পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকের রচনা। এঁদের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য, কবি জৈনুদ্দিনের 'রসুল বিজয়' অন্যতম। এবং এই সময়ের ইসলাম ধর্মবিষয়ক সমুল্লেখ্য দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন সৈয়দ সুলতান এবং মোহাম্মদ খান।

ইসলামি প্রেম-কাব্যের প্রসার মূলত ঘটেছিল রোসাঙ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতাতেই। আসলে ইসলামি ঐতিহ্যের আরবি-ফারসি-হিন্দি নির্ভর সকল রকমের কাব্যরূপ প্রথামাবধি চট্টগ্রাম অঞ্চলেই বিকশিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের আগে থেকেই চট্টগ্রামে বাংলা সাহিত্য চর্চার একটি ইসলামিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। চট্টগ্রামের সীমানা পেরিয়ে রোসাঙের মগ রাজাদের হাতে এই সাহিত্য রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করে। ধর্মীয় প্রসঙ্গে যৎসামান্য সম্পৃক্ত হলেও আসলে এ সাহিত্য ছিল একান্তভাবে মানবিক প্রেমবেদনা ঘনিষ্ঠ। বস্তুত মধ্যযুগের এক সন্ধিলগ্নে বাংলাদেশের এই উপান্তভূমিতে জীবন ও সংস্কৃতি সাধনার এমন এক উদার প্রসন্ন ব্যাপ্তি ঘটেছিল, যথার্থই যা বিস্ময়কর।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিষয়বস্তুর নতুনত্বের জন্য আরাকানের মুসলিম কবিদের রচনা ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে বাংলা কাব্যের এইরূপ অভাবনীয় সমৃদ্ধি এবং হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির গভীর মিলন এইসব কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা দেখি বাংলা সাহিত্যে দেবতার মাহাত্ম্য, কিংবা দেবকল্প মানুষের জীবন কাহিনি স্থান পেয়েছে।আরাকানের মুসলমান কবিরা মানব-মানবীর রোমান্টিক কাহিনি রচনা করে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের মহিমা ঘোষণার মাধ্যমে সৃষ্টির নতুনত্বে বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করলেন। ভক্তি কথার বদলে প্রেমের সঙ্গীতে দেবতার বদলে মানুষের কামনা-বাসনার অভিব্যক্তিতে জীবন-রসের সহজ স্রোত বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত হল। সুতরাং, এই সব দিক থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের কাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যে তাৎর্যপূর্ণ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যিকারের যে রাজসভার নাম চিরসমুজ্জ্বল তা

মন্তব্য

হল রোসাঙের রাজসভা। ব্রিটিশ ভারতে চট্টগ্রাম বঙ্গদেশে অন্তর্ভুক্ত ছিল। দৈন্দিন আচার ব্যবহার, ভাষা উচ্চারণ পদ্ধতির বিচারে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের এই প্রত্যন্ত অঞ্চল বাংলা সমাজে অনন্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অন্তত দেড়শ বছর চট্টগ্রাম আরাকান রাজসভার অন্তর্ভুক্তি হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের শুরুতে জাহাঙ্গীর রাজত্বে চট্টগ্রামের আরাকান রাজসভার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের শুরুতে জাহাঙ্গীর রাজত্বে চট্টগ্রামের বৃহত্তম অংশ মোঘল বাংলায় আবার ফিরে এসেছিল। তাই চট্টগ্রাম যেমন আরাকান আচার আচরণের দ্বারা প্রভাবিত আরাকানও তেমনি বঙ্গীয় সংস্কৃতি এড়াতে পারেনি। বস্তুত পঞ্চদশ শতকের ইসলামি বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ রচিত হয়েছিল আরাকন ভূমিতে সেখানকার রাজা বা রাজপারষদগণের পৃষ্ঠপোষকতায়। আরাকানের রোসাঙ রাজসভায় আমরা বাংলা ভাষার প্রথম শক্তিশালী মুসলমান কবির দর্শন পাই এবং প্রথম আদরণীয় মানবীয় প্রণয় কাহিনির পরচয় লাভ করি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই দুটি বস্তরই গভীর অর্থ আছে। কারণ—

(এক) মুসলমান বিদ্বজ্জন আরবি, ফারসির চর্চা সত্ত্বেও বাংলার সৃষ্টিক্ষেত্রে প্রবেশ করল।

(দুই) বাংলা সাহিত্য আর কেবল হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিরোধের সাহিত্য থাকল না। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে হিন্দু-মুসলমান বাঙালির সাংস্কৃতি সংযোগের সাহিত্য হয়ে উঠল।

(তিন) বাংলা সাহিত্য এতদিন দেবদেবীর মাহাত্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিল, প্রকাশ্যে মানবীয় মহিমা নিয়ে কাব্য লেখা হয়নি। অথচ সংস্কৃত সাহিত্যে মানুষের প্রণয় কাহিনির অভাব ছিল না এবং লোকসমাজ চিরদিনই এইসব প্রণয় কাহিনি বলত, গাইত, শুনত। কিন্ত মধ্যযুগের কবিরা রোমান্সের বিস্ময়রস পার্থিব জীবনে না খুঁজে তখনও তাঁরা তা খুঁজতেন অলৌকিকতায়, দেবদেবী, যোগী, মায়াবী, অপ্সরা প্রভৃতির ক্রিয়াকর্মে। যাকে মানবচরিত্র বলে তা তখনও কাব্যে ছিল না।

(চার) দৌলত কাজী প্রথম শক্তিশালী বাঙালি মুসলমান কবি। 'লোরচন্দ্রানী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্মরণীয় সেকুলার বা ধর্ম সংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয়কাব্য এবং রোসাঙের রাজসভা এ ধারার উদ্ভবক্ষেত্র।

(পাঁচ) মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্যে মুসলমান জীবন ও চিন্তা প্রায় অনুপস্থিত।

মন্তব্য

এমন সময়ে রোসাঙের রাজসভায় ধর্মসংস্কারমুক্ত সুফি ও হিন্দু আধ্যাত্মিক সাধনার স্বাভবিক সম্মেলন সহজ হয়ে উঠল। অন্যদিকে সেখানে লৌকিক প্রণয় কাহিনির অনুশীলনে ধর্ম সংস্কারমুক্ত মানবতার ধারণাও জয়লাভ করল। কবি দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রনী' বা 'সতীময়না' এই হিসাবে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার নতুন প্রয়াস, তার ধর্ম সংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয় কাহিনির প্রথম একটি কাব্য। কেননা সাহিত্য যতক্ষণ পরলোক ও ধর্মের গাঁটছড়া ছেড়ে মর্ত্যলোক ও মানব প্রকৃতির সঙ্গে মিলনসূত্র খুঁজে না পায় ততক্ষণ সাহিত্য আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয় না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম-আরাকানে দুজন শক্তিমান মুসলমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল— বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যাদের অবদান যথেষ্ট। এঁরা হলেন দৌলত কাজী এবং সৈয়দ আলাওল। এই কবিরা ধর্মনিরক্ষেপ দেবভাবনামুক্ত অবিমিশ্র মানবিক চেতনার জয়গান গেয়েছেন— যা মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারা থেকে স্বতন্ত্র। ব্রহ্মদেশের নিম্নভাগের সংলগ্ন অঞ্চল ছিল আরাকান। এখানকার অধিবাসীরা ছিলেন মগ। রাজাও ছিলেন মগ জাতীয় বৌদ্ধ। এই রাজাদের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবিরা কাব্য রচনা করেছিলেন।

১২.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম সাহিত্য সম্পর্কে যা জানো লেখো।

২। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের কৃতিত্ব উল্লেখ করো।

৩। সপ্তদশ শতকের চট্টগ্রামের রোসাঙ্গ রাজসভার দরবারি সাহিত্য আলোচনা করো।

১২.৫। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - দেবেশ আচার্য।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীমন্ত কুমার জানা (অখণ্ড)।

৩। পদ্মাবতী সম্পাদনায় - দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)।

৪। ইসলামী বাংলা সাহিত্য - ডঃ সুকুমার সেন।

একক - ১৩ পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী প্রসঙ্গ, কবি পরিচিতি, মাগন প্রসঙ্গ, কাব্যের উৎস, রসবিচার, পদ্মাবতী রূপক না রোমান্স কাব্য।

বিন্যাসক্রম —

১৩.১। পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী প্রসঙ্গ

১৩.২। কবি পরিচয়

১৩.৩। মাগন পরিচয় ও পদ্মাবতী কাব্যে মাগন প্রসঙ্গ

১৩.৪। কাব্যের উৎস

১৩.৫। রসবিচার

১৩.৬। পদ্মাবতী রূপক না রোমান্স কাব্য

১৩.৪। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১৩.৫। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১৩.১। পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী প্রসঙ্গ

মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ ঠিক ঐতিহাসিক কাব্য নয়, কিছুটা ইতিহাস মিশ্রিত এবং কিছুটা রূপকথাধর্মী ও তাত্ত্বিক রূপকখচিত প্রেমকাব্য। কাব্যটির দুটি ভাগ। প্রথমটি অনৈতিকহাসিক উপাখ্যান, রত্নসেন-নাগমতি-পদ্মাবতী কাহিনী এবং দ্বিতীয়টি অর্ধ-ঐতিহাসিক আখ্যান— আলাউদ্দীন-রত্নসেন-পদ্মাবর্তী প্রসঙ্গ।

সিংহলের রাজা গন্ধর্বসেনের কন্যা পদ্মবতীর প্রিয় শুকপাখীর নাম হিরামন। যৌবনবতী পদ্মাবতীর জন্য শুকপাখীর দেশদেশান্তর খুঁজে বর আনার প্রস্তাবে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পাখীটিকে মেরে ফেলবার আদেশ দিলে পদ্মাবতীর অনুরোধে তার প্রাণরক্ষা হল বটে কিন্তু কিন্তু হিরামন একদিন উড়ে পালাতে গিয়ে এক ব্যাধের হাতে ধরা পড়ল এবং সিংহলের হাটে এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্রীত হয়ে চিতোর দেশে উপনীত হল। নাগমতির স্বামী রত্নসেন তখন চিতোরের রাজা। এক লক্ষ টাকায় তাঁর কাছে বিক্রীত হল সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীর শুকপাখী। শুকপাখীর মুখে পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা শুনে নাগমতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যার আদেশ দিলেন কিন্তু ধাত্রীর করুণায় হিরামনের প্রাণরক্ষা হল এবং রাজা রত্নসেন যথাসময়ে শুকের মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে শুকপাখীকে

নিয়ে যোগীর ছদ্মবেশে সিংহলে গমন করলেন। সেখানে শুকপাখীর সাহায্যে রত্নসেন ও পদ্মাবতীর গোপন সাক্ষাৎ হল এবং প্রাথমিক বাধাবিপত্তির পর অবশেষে হরগৌরীর সহায়তায় রত্নসেন-পদ্মাবতীর বিবাহ হল। এদিকে পক্ষীমুখে নাগমতির দুঃখের কথা শুনে পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে রত্নসেনের চিতোর প্রত্যাবর্তন— পথিমধ্যে সমুদ্র-পরীক্ষার সকট এবং পরিশেষে পদ্মাবতীকে নিয়ে রাজার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। অতঃপর নাগমতি ও পদ্মাবতীর সঙ্গে রত্নসেনের দাম্পত্য জীবনযাপন এবং নাগমতির গর্ভে নাগসেন ও পদ্মাবতীর গর্ভে কমলসেন নামে রত্নসেনের দুটি পুত্রলাভ। মন্তব্য

এই পর্যন্ত পদ্মাবৎ কাব্যের প্রথমাংশ। অতঃপর শুরু হল এ কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ। যাদুবলে প্রতিপদ তিথিতে দ্বিতীয়বার চন্দ্র দেখিয়ে রাজা ও তাঁর পারিষদবর্গকে প্রতারিত করার অপরাধে রাঘবচেতন নামক এক ব্রাহ্মণকে রত্নসেন চিতোর থেকে নির্বাচনদণ্ড দিলে ব্রাহ্মণের বিদায়কালে পদ্মাবতী তাঁকে একটি কঙ্কণ প্রদান করলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণ রাঘবচেতন দিল্লীতে গিয়ে সুলতান আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করে সেই কঙ্কণ প্রদর্শন করলে বিমোহিত সুলতান দূত প্রেরণ করে রত্নসেনের কাছে পদ্মাবতীকে দাবী জানালেন। ক্রুদ্ধ রত্নসেন এই অন্যায় দাবী প্রত্যাখ্যান করায় আলাউদ্দীন দীর্ঘকাল চিতোর অবরোধ করে রইলেন কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হতে না পেরে কপট সন্ধি করলেন। সুলতান রত্নসেন কর্তৃক চিতোর গড়ের ভিতর আমন্ত্রিত হয়ে দর্পণে পদমাবতীর রূপ দর্শন করে বিহ্বল হলেন এবং দুর্গের সিংহদ্বার থেকে বিদায় মুহূর্তে অকস্মাৎ কৌশলে রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন। রত্নসেনের অনুস্থিতির সুযোগে কুম্ভলনের নৃপতি দেবপাল পদ্মাবতীর কাছে যেমন কুমুদিনী নামী এক দূতীকে পাঠালেন তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে আসার জন্য তেমনি স্বয়ং সুলতান আলাউদ্দীনও একই উদ্দেশ্যে এক দূতীকে প্রেরণ করলেন পদ্মাবতীকে বশ করার জন্য, কিন্তু দুজনেই পর পর ব্যর্থ ও প্রথমজন লাঞ্ছিতা হল। অতঃপর রত্নসেনের গোরা ও বাদলের কূটবুদ্ধিতে অন্তঃপুরিকাা রমণীয় ছদ্মবেশে রাজপুত যোদ্ধগণ দিল্লীতে গিয়ে পদ্মাবতী সাক্ষাতের ছলনায় রত্নসেনকে মুক্ত করে চিতোরে ফিরে এল, কেবল পশ্চাদ্ধাবিত সুলতান সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বীর গোরা নিহত হল। চিতোরে ফিরে পদ্মাবতীর কাছে দেবপালের দূরভিসন্ধির কথা শুনে ক্রুদ্ধ রত্নসেন দেবপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে দেবপালকে স্বহস্তে নিধন করলেন এবং স্বয়ং আহত হয়ে

মন্তব্য

রাজ্যে আগমন করে মৃত্যুবরণ করলেন। নাগমতি ও পদ্মাবতী সহমরণে গেলেন। ইতিমধ্যে আলাউদ্দীন পুনরায় চিতোর আক্রমণ করলেন। এবার যুদ্ধে রাজপুতবীরসহ বাদলও নিহত হলেন। সুলতান চিতোর অধিকার করলেন এবং ভস্মাবশেষ দেখে দিল্লীতে ফিরে গেলেন।

১৩.২। কবি পরিচয়

আনুমানিক সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই ফতেয়াবাদ বা ফরিদপুরের অন্তর্গত জালালপুরে কবি আলাওলের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন জালালপুরের অধিপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য। মজলিস কুতুব ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন। সুতরাং আলাওলের জন্ম এই সময়কালের পরে নয়। পিতার সঙ্গে আলাওল জলপথে পর্যটনকালে জলদৃশ্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন; এর ফলে পিতার জীবন নাশ হয় এবং আলাওল আরাকান বা রোসাঙে এসে উপনীত হন। এখানে তিনি প্রথমে রাজ অশ্বারোহী সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং পরে মুখ্য পাটেশ্বরী যশস্বিনীর অমাত্য মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে থদোমিন্‌তার আরাকানের আধিপতি হন, এবং যশস্বিনী হন তাঁর মুখ্য পাটেশ্বরী। অতএব ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তার পর কোনো এক সময় আলাওল মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আলাওলের পাণ্ডিত্য, সঙ্গীতনৈপুণ্য এবং আরও নানাগুণের জন্য আলাওলকে মাগন গুরুর মতো সমাদর করে অমাত্যসভায় নিয়ে আসেন। অতঃপর বহুভাষাবিদ ও কাব্যরসিক গুণী মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য পদ্‌মাবৎ-এর অনুবাদ শুরু করেন এবং থদো-মিন্‌তারের রাজত্বকালের মধ্যেই (১৬৪৫ ১৬৫২) কোনো এক সময় তা শেষ হয়। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে থদো-মিন্‌তারের মৃত্যু হয় এবং মাগন ঠাকুরের পরিচলনায় শিশপুত্র শ্রীচন্দ্র সুধর্মাকে নিয়ে বিধবা রাজপত্নী রাজত্ব করতে থাকেন। অতঃপর আলাওল মাগন ঠাকুরের নির্দেশে 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জমাল' কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মাগনের আকস্মিক মৃত্যুতে কিয়দংশ রচনা করে আলাওল ও গ্রন্থ রচনা বিরত হন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের মহামাতা সোলেমানের আদেশে আলাওল তাঁর পূর্বসূরী কবি দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য 'সতী ময়না বা লোর চন্দ্রাণী' সমাপ্ত করেন। অতঃপর আলাওল ১৬৬০ খ্রীষ্বাব্দে

আরাকনরাজের সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজামীর ফারসী কাব্য ‘হপ্তপয়করের’ অনুবাদ ‘সপ্তপয়কর’ রচনা করেন। এই গ্রন্থে শাহজাদা সুজার আরাকানে আগমন এবং আরাকান রাজের কাছে শরণ গ্রহণের উল্লেখ আছে। এইবছর আলাওলের জীবনেও দেখা দেয় রাজনৈতিক দুর্বিপাক। ১৬৬০ খ্রীষ্বাব্দে গৃহযুদ্ধ-বিড়ম্বিত শাহ সুজা খিজিয়ার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলার হাতে পরাজিত হয়ে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কোনো কারণে আরাকানরাজের বিরাগভাজন হওয়ায় সপরিবারে নিহত হলেন। এদিকে মীর্জা নামক এক শত্রু কর্ত্তৃক শাহসুজার সঙ্গে আলাওলের ঘনিষ্ঠতার মিথ্যা অভিযোগ রাজদ্বারে আনীত হলে রাজদ্রোহিতার অপরাধে কবিকে পঞ্চাশ দিনের কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, পরে এই অভিযোগ অমূলক প্রমাণিত হলে কবি মুক্তি লাভ করেন বটে কিন্তু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় দারিদ্র্য দুঃখের সম্মুখীন হলেন। এই দারিদ্র্য অবস্থার মধ্যে কবি ১৬৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামী স্মৃতিশাস্ত্র ‘তোহ্ফা’ গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তা সম্পূর্ণ হয়। এই সময় কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সোলেমান। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ মুহম্মদের নির্দেশে আলাওল পূবরিদ্ধ কাব্য ‘সৈফুলমূলক বদিউজ্জমালের’ শেষ অংশ সমাপ্ত করেন। অবশেষে কবি মজলিস নবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বশেষ কাব্য ‘সেকেন্দারনামা’ রচনা আরম্ভ করেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে কবিজীবনে যে দুঃখদুর্দশার আরম্ভ হয়েছিল ১১ বছর পর অর্থাৎ ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে মজলিসের অনুগ্রহে আবার সুদিন দেখা দিল। নিজামীর বৃহৎ ফারসী কাব্য ‘ইস-কন্দর’ নামার অনুবাদ করতে বৃদ্ধ আলাওলের নিঃসন্দেহে কয়েকবছর সময় লেগেছিল। আনুমানিক ১৬৭৩ অথবা ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে কবি আলাওলের উত্থান-পতন-বন্ধুর জীবনের অবসান হয়।

‘পদ্মাবতী’ আলাওলের সর্বপ্রথম রচনা। সুতরাং এই কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে তাঁর জীবনের প্রথমদিকের পরিচয়টুকুই বর্তমান। এখান থেকে কবি জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল গৌড়বঙ্গের অন্যতম প্রধান স্থান হল ফতেয়াবাদ, তার অন্তর্বর্তী জালালপুরে বহু গুণবানের বাস। সেখানকার অধিপতি মজলিস্ কুতুব। তাঁর অমাত্যপুত্র আলাওল। কার্যব্যপদেশে পিতার সঙ্গে জলপথে যেতে পর্তুগীজ হার্মাদের নৌকার সম্মুখীন হলে বহু সংগ্রামের পর পিতা নিহত হন এবং আলাওল আহত হয়ে রোসাঙ্গে

মন্তব্য

উপনীত হলেন। সেকানে নিজের দুঃখকথা নিবেদন করে রাজঅশ্বারোহীদলে নিযুক্ত হলেন। সে সময় রোসাঙ্গনগরে যেসব গুণীরা বাস করতেন তারা আলাওলকে তালিব এলেম বলে বিশেষ সমাদর করতেন। এঁদের মধ্যে রাজ্যের মুখ্য পাটেশ্বীর অমাত্য মাগন ঠাকুর কবিকে নানা উপহারে ভূষিত করলেন। মাগনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আলাওল তাঁর সভার অন্যতম সভাসদরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বহুগুণী পরিবৃত এই অমাত্য সভায় একদা জায়সী রচিত হিন্দী পদ্মাবৎ কাব্যকথা শুনে মাগন ঠাকর আলাওলকে এই কাব্যকাহিনি সরস পয়ারে অনুবাদ করতে আজ্ঞা দিলেন। রোসাঙ্গের সকলে হিন্দুস্থানী ভাষা বোঝেনা এই কারণেই এই অনুবাদের প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাগন আলাওলকে আসরফ খাঁর আজ্ঞায় দৌলত কাজীর 'লোর চন্দ্রাণী' কাব্য অনুবাদের উল্লেখ করলেন। মাগন ঠাকুরের এই আদেশ শিরোধার্য করে বহু বিনয় প্রকাশ করে অতঃপর আলাওল পদ্মাবতী কাব্য রচনা শুরু করলেন।

পদ্মাবতী কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে বর্ণিত আলাওলের এই আত্মবিরণের সমর্থন পাওয়া যাবে পরবর্তী কালের রচনা 'সয়ফুলমূলক বদিউজ্জমাল' এবং 'সেকেন্দারনামা' গ্রন্থ দুটিতে। শেষ রচনা 'সেকেন্দারনামা' গ্রন্থে কবির আনুপূর্বিক জীবনকথা আছে। সেখানে কবির প্রথম জীবন সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু কিছু নতুন কথা আছে। ফতেয়াবাদের পরিচয় প্রসঙ্গে আলাওল লিখেছেন-

হিন্দুকুলে মহাসভা আছে ভট্টাচার্য।
ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্যরাজ্য।।

আরাকানে রাজ-অশ্বারোহী পদে থাকার সময় তিনি বহু সম্ভ্রান্ত সভাসদকে নৃত্যগীত শেখাতেন। (সেখানে কি মাগন ঠাকুরও ছিলেন?) আলাওলের উত্তর-জীবন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি হল— শাহ সুজাসংক্রান্ত অপবাদের ফলে আলাওলের পঞ্চাশ দিনের কারাবাস এবং মুক্তিলাভের পর দারিদ্র্যদশার বর্ণনা। এর এগারো বছর পর মজলিস নবরজের পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরায় সৌভাগ্যলাভের কথা। আর রোসাঙ্গের কাজী সৈয়দ মাসুদ কর্তৃক আলাওলাকে কাদিরি খিলাফৎ দান। সুফী সম্প্রদায়ের প্রধান চার সম্প্রদায়ের মধ্যে আলাওল যে কাদিরি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিলেন সেকেন্দার নামা গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে।

১৩.৩। মাগন পরিচয় ও পদ্মাবতী কাব্যে মাগন প্রসঙ্গ

মন্তব্য

শেখ বংশজাত সিদ্দিকী গোত্রভুক্ত মুসলমান ধর্মাবলম্বী মাগনের জন্ম সম্ভবত চট্টগ্রামে। আল্লার কাছে 'মাগিয়া' বা প্রার্থনা করে তাঁর জন্ম হয় বলে তাঁর নাম মাগন। তিনি ছিলেন রোসাঙ্গরাজা নরপদিগ্যির বিশ্বস্ত মন্ত্রী।বৃদ্ধরাজা নরপদিগ্যি এই বিশ্বাসী অমাত্যকেই তাঁর অল্পবয়সী কন্যার অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করেন। আবার নরপদিগ্যির মৃত্যুর পর এই কন্যা রাজ্যের মুখ্য পাটেশ্বরী হলে পর মাগনকে তিনি রাজা থদো-মিন্‌তারের মুখ্য পাত্ররূপে পুনরায় নিযুক্ত করলেন। অতঃপর ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে থদো-মিন্‌তারের মৃত্যু হলে মাগন রাজার নাবালক পুত্র চন্দ্র সুধর্মার অভিভাবক রূপে বিধবা রাজপত্নীক রাজকার্যে সহায়তা করতেন। সুতরাং তিন পুরুষ ধরে আরাকান রাজপরিবারে মাগনের বিশেষ প্রভুত্ব ছিল। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বা তার পরবর্তী কোনো একসময় আলাওলকে তিনি তাঁর অমাত্যসভায় নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ, বিদ্যোৎসাহী, কাব্যরসিক এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এদিক থেকে তিনি শ্রীসুধর্মার মহামাত্য আসরফ খাঁর সঙ্গে তুলনীয়। দৌলত কাজীর সতী ময়না বা লোরচন্দ্রারী কাব্যের প্রথমে রোসঙ্গরাজ প্রশস্তি অধ্যায় থেকে যেমন জানা যায় যে আসরফ খাঁর সভায় আরবী ফারসী ভাষায় নানা তত্ত্ব-উপদেশ এবং গুজরাতি গোহারি ঠেট প্রভৃতি ভাষায় নীতিবিদ্যা কাব্য ও শাস্ত্রের নানাবিধ আলোচনা হতে তেমনি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের মাগন প্রশস্তি থেকে মাগনের বিদ্যোৎসাহিত্য ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় মেলে।

পদ্মাবতী কাব্যে দুরকম ভাবে মাগন প্রশস্তি আছে। এক, স্তুতিখণ্ডে মাগন প্রশস্তি অধ্যায় জুড়ে বিস্তারিত ভাবে; দুই, পদ্মাবতী কাব্যের অধিকাংশ অধ্যায়ের শেষে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে। মাগন প্রশস্তি অধ্যায়ে মাগনের রূপ, গুণ, কীর্তির অকুণ্ঠ প্রশংসা আছে। রাজসৈন্য বিভাগের মন্ত্রী বড় ঠাকুরের পুত্র মাগন পিতার জীবদ্দশাতেই নিজগুণে তাঁর বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। আবার মহারাণী যশস্বিনীর অভিবক ও মুখ্য অমাতারূপে তিনি ঐশ্বর্য খ্যাতিও কম অর্জন করেননি। তাঁর দেহ ছিল দুর্বাদলশ্যাম, মাথায় মগধ দেশীয় শুভ্র পাগড়ী। আলাওল তাঁর রূপের যে আলঙ্কারিক বর্ণনা করেছেন তার থেকে বিশেষ কোনোরূপ ব্যক্তিপরিচয় পাওয়া না গেলেও তিনি সুপুরষ ছিলেন বলেই মনে হয়। তিনি স্বয়ং বাংলা, আরবী, ফারসী, মঘী এবং হিন্দি ভাষা জানতেন;

মন্তব্য

এছাড়া ভেষজ ও যাদুবিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। বহুভাষাবিদ্ এবং বহু শাস্ত্রজ্ঞানী এই প্রভাবশীল অমাত্যটি এদিকে যেমন ছিলেন অকৃপণ দাতা তেমনি পরোপকারী। আলাওল তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন—

মহাদানী মহামানী মহাসাহসিক।
অহিংসক আস্তশূন্য মর্য্যাদা অধিক।। (মাগন প্রশস্তি, পৃ: ১৮)

রাজরোষে সর্বস্বান্ত ব্যক্তিও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করলে উদ্ধার হয়ে যেত।

পরদেশী মুসলমানদের শ্রেণীনির্বিশেষে তিনি পুরস্কারে সম্মানিত করতেন। এইভাবে মাগনের রূপ গুণ ও কীর্তির মহিমা কীতন করে আলাওল মাগন প্রশস্তি অধ্যায় শেষ করেছেন।

পদ্মাবতী কাব্যের বিভিন্ন স্থানে ভণিতাদানকালে আলাওল মাগনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে যে স্তুতি-বচনগুলি উচ্চারণ করেছেন সেইসব স্তুতিবচনের মধ্যে মাগনের দানশীলতার প্রসঙ্গই সর্বাধিক। যথা—

শ্রীযুত মাগন ধীর রসিক নাগর।
শত্রুজিত মিত্রপাল দয়ার সাগর।। (রত্নসেন বন্ধন খণ্ড; পৃঃ ৩২০)

দানশীলতার সঙ্গে মাগনের কাব্যরসিকতার পরিচয় আলাওল একাধিক ক্ষেত্রে দিয়েছেন। রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডের একটি ত্রিপদী শেষে কবি ভণিতা দিয়ে লিখেছেন—

শ্রীযুত মাগন বীর কাব্যরসে অতি ধীর
ত্রিভুবনে নবরসজ্ঞতা
যার মনে যেই বাঞ্ছা পুরায়ন্ত সেই ইচ্ছা
কীলকালে বলিসম দাতা।।
তাহান আরতি ধরি মনেত সাহস করি
বিরচিল সরস পয়ার।
হীন আলাওলে ভণে মিনতি পণ্ডিত স্থানে

টুটা হইলে শুধিয় অক্ষর।। (পৃ. ১৮৩) মন্তব্য

মাগন যে কেবল কবিত্বের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাই নয়, তিনি নিজেও কবি ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। কোরেশী মাগনের নামে 'চন্দ্রাবতী' নামক একখানি অসম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া যায়। 'পদ্মাবতী' কাব্যের ভণিতায় একস্থানে আলাওল মাগনের কবিকীতির আভাস দিয়ে লিখেছেন—

কবি আলাওলে মধুর গায়।

মাগন কবিকৃতি রহু সদায়।। (পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ড,পৃ: ২৭৪)

মাগন প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। পদ্মাবতী কাব্যের শেষাংশে সন্দেহজনকভাবে মাগন প্রসঙ্গের অনুল্লেখ লক্ষ করা যায়। গোরা-বাদল যুদ্ধখণ্ডের পর থেকে অনুবাদ যেখানে মূল থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়েছে সেখানে মাগনের উল্লেখ আর লক্ষ্য করা যায় না। হবিবী সংস্করণে অবশ্য দুটি ক্ষেত্রে মাগনের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেগুলি সন্দেহজনক, কারণ পুঁথি দুটিতে এগুলি নেই। সুতরাং কাব্যের শেষাংশে মাগনের বিস্ময়কর অনুল্লেখ দেখে ড: সুকুমার সেন এবং ড: সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল শেষাংশের প্রামাণিকতা সম্পর্কে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন তাকে একেবারে অমূলক বলা যায় না। অবশ্য এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ প্রমাণ না মেলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়া যাবে না, তবে এটা ঠিক যে 'পদ্মাবতী কাব্যের' শেষাংশে মাগন প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি বিস্ময়কর।

১৩.৪। পদ্মাবতী কাব্যের উৎস

আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যটি মৌলিক গ্রন্থ নয়, অনুবাদ। মূল কাব্যটি হল অবধী হিন্দী ভাষায় লেখা মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্‌মাবৎ'। আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্যের প্রথমদিকে 'কবি পরিচয়' ও 'কাহিনী সূত্র' অধ্যায় দুটিতে 'পদ্মাবতী' কাব্যের উৎসরূপে মূল কবি ও কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। মূল 'পদ্‌মাবৎ' কাব্যের অস্তুতিখণ্ডের অষ্টাদশ স্তবক থেকে ত্রয়োবিংশ স্তবক পর্যন্ত জায়সী যে পীরপরম্পরায় গুরুপরিচয় ও আত্মপরিচয় দিয়েছেন,— আলাওল তদবলম্বনে জায়সীর সংক্ষিপ্ত কবিপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। জাইস নগরে বসবাসকারী সিদ্দিকী বংশোদ্ভূত এই কবির পরিচয় দান কালে আলাওল জায়সীর গুরুকূলের উপর যতোটা গুরুত্ব দিয়েছেন বন্ধুবর্গের বর্ণনায় ততোটা

মন্তব্য

গুরুত্ব দেননি। জায়সীর চারবন্ধুর উল্লেখমাত্র 'পদ্মাবতী'তে আছে, বিস্তারিত বিবরণে আলাওল আগ্রহ দেখাননি। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য রচনাকালে শেরশাহ যে দিল্লীর সুলতান ছিলেন এ ইঙ্গিতটুকু অলাওল যথাস্থানে দিয়েছেন, কিন্তু জায়সীর কাব্যে পাঁচ স্তবক জুড়ে (অস্তুতি খণ্ড, ১৩-১৭) শেরশাহের সম্পর্কে যে বিস্তারিত আছে আলাওল অবাঞ্চনীয়বোধে তা বর্জন করে তার পরিবর্তে রোসঙ্গ রাজার প্রশস্তি কীর্তন করেছেন।

পদ্মাবতীর 'কাহিনী সূত্র' অধ্যায়ে আলাওল তাঁর কাব্যের উৎসপরিচয় দিতে গিয়ে জায়সীর কাব্যকাহিনীর সংক্ষিপ্ত সূচীনির্দেশ করেছেন। প্রথমেই উল্লেখ করেছেন পদ্মাবৎ কাব্যের রচনাকাল। কিন্তু আলাওল ভুল করে লিখেছেন— 'সংখ্যা সপ্তবিংশ নব শত' অর্থাৎ ৯২৭ হিজরী জায়সীর পদমাবৎ কাব্যের অস্তুতি খণ্ডের সর্বশেষ চোপাই এর প্রথম পঙক্তিতে স্পষ্ট করেই জানানো হয়েছে সন নব সই সৈতালিশ সহা অর্থাৎ ৯৪৭ হিজরি বা ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ। অতঃপর আলাওল সংক্ষেপে এইভাবে মূল কাহিনীসূত্রটি নির্দেশ করেছেন—

চিতোর দুর্গের অধিপতি রাজা রত্নসেন শুকমুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে মুগ্ধ হলেন। ষোলশো রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে যোগীবেশে চললেন সিংহলে। অনেক অরণ্যপথ পেরিয়ে যখন তাঁরা সিন্ধুতীরে উপনীত হলেন তখন রাজা গজপতি সিংহলে যাবার জন্য তাঁদের নৌকা দিলেন। সিংহল দ্বীপে গিয়ে অনেক দুঃখ কষ্টের পর বহু সাধনায় রত্নসেন পদ্মাবতীকে লাভ করলেন। অতঃপর এক পক্ষীমুখে প্রথমা পত্নী নাগমতির দুঃখ কথা শুনে রাজা রত্নসেন পদ্মাবতীসহ স্বদেশ অভিমুখে চলনে। পথে সমুদ্রবিপর্যয় উত্তীর্ণ হয়ে রাজা চিতোরে প্রত্যাবর্তন করলে অনেক আনন্দোৎসব হল।

এদিকে রত্নসেনের রাজসভায় রাঘব চেতন নামে এক গুণী অবিবেচকের মতো প্রতিজ্ঞা করে যাদু বলে প্রতিপদের দিন দ্বিতীয়বার চাঁদ দেখাল। পরে রত্নসেন প্রকৃত ব্যাপার জানতে পেরে তাকে দেশ থেকে নির্বাসন দিলেন। পদ্মাবতী নির্বাসিত ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করার জন্য বিদায়কালে সমাদর করে নিজের হাতের কঙ্কণ দান করলেন। সেই সময় আলাউদ্দীন দিল্লির সুলতান। প্রচণ্ড তাঁর প্রতাপ। পণ্ডিত রাঘব চেতন তাঁর কাছে গিয়ে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করল। শুনে সুলতান উল্লসিত হয়ে পদ্মাবতীর দাবী জানিয়ে রত্নসেনের কাছে শ্রীজা নামক এক বিপ্রকে পাঠালেন। কিন্তু শ্রীজা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসে সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে চতুরঙ্গ সেনাসহ চিতোর আক্রমণ করলেন। বারোবছর

অবিরাম যুদ্ধের পর অবশেষে সুলতান সন্ধির কৌশলে রত্নসেনকে বন্দী করলেন। বন্দী রত্নসেনকে নিয়ে আলাউদ্দীন দিল্লী ফিরে গেলেন এবং রাজাকে কারাগারে রেখে নানাভাবে পীড়ন করতে লাগলেন। গোরা ও বাদল নামে রত্নসেনের দুই সেনাপতি কপট কৌশলে রত্নসেনকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনল। রত্নসেন চিতোরে ফিরে পদ্মাবতীর সঙ্গে সুখে রজনী অতিবাহিত করলেন। একসময় পদ্মাবতীর মুখে রাজা দেবপালের দুরভিসন্ধির কথা শুনে রত্নসেনের চিত্ত বিচলিত হল। তৎক্ষণাৎ দেবপালের রাজ্যে গিয়ে রত্নসেন যুদ্ধে তাকে নিধন করলেন এবং স্বয়ং আহত হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন। এর সাত দিন পর রত্নসেনের মৃত্যু হল দুইরাণী নাগমতি ও পদ্মাবতী তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হলেন। ইতিমধ্যে দিল্লীশ্বর পুনরায় রণসাজে সজ্জিত হয়ে চিতোর নগরে উপনীত হলেন। আলাউদ্দীন চিতোরে এসে চিতাধূম দেখে এবং পদ্মাবতী সতী হয়েছেন শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। অতঃপর চিতোরকে ইসলাম রাজ্য করে সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।

আলাওল কাহিনী-সূত্র অধ্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে জায়সীর মহাকাব্যোপম বিশাল কাব্যকাহিনীর যে পরিচয় দিয়েছেন তা যথাযথ। 'কাহিনী সূত্রে' তিনি সূত্রটুকুই উল্লেখ করেছেন, ঘটনার বর্ণনা ও সমারোহ বাদ দিয়েছেন। অনুবাদ করবার সময় শেষাংশ বাদে তিনি মূলের অধিকাংশ খণ্ডের বেশীর ভাগ স্বতবকই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থের জায়সী খণ্ডের সঙ্গে আলাওল খণ্ডকে পাশাপাশি মেলালেইদেখা যাবে এমন নিষ্ঠাবান অনুসরণ মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে অল্পই আছে। সামান্য কয়েকটি খণ্ড বর্জন এবং দু একটি খণ্ড সংযোজন ছাড়া অনেক দূর পর্যন্ত অনুবাদের দ্বারা মূলানুসারী। গোরা-বাদল যুদ্ধখণ্ড পর্যন্ত যেখানে পদ্মাবতী কাব্যকে মূলের সঙ্গে প্রায় প্রতি স্তবকে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়া যায় সেখানে হঠাৎ অনুবাদের শেষাংশে এসে আলাওলের স্বাধীন হয়ে ওঠা বিস্ময়কর। এমন কি উৎস-নির্দেশক কাহিনীসূত্রের মধ্যে আলাওল সংক্ষেপে যে কাহিনী পরিচয় দিয়েছেন, অনুবাদের শেষাংশে তাকে লঙ্ঘন করে অনুবাদ কাব্যটিকে এক অবিশ্বাস্য অতিনাটকীয় পরিণতি দান করা হয়েছে। অনুবাদ কাহিনীর এই অস্বাভাবিক পরিণাম ও মূল কাহিনীর সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে ডঃ সুকুমার সেন অভিমত দিয়েছেন যে গোরা বাদল যুদ্ধ খণ্ডের পর থেকে পরবর্তী দুর্বল অংশ আলাওলের রচনা নয়। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

এই সন্দেহের সমর্থনে আর কিছু যুক্তি দিয়েছেন— যথা শেষাংশে মাগন ঠাকুরের উল্লেখ-বিরলতা, দারা-সিকন্দর প্রসঙ্গের উল্লেখ এবং রচনারীতির পার্থক্য ইত্যাদি। কিন্তু এই সন্দেহগুলি ছাড়া এমন কোনো পাথুরে প্রমাণ নেই যার থেকে সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে এ কাব্যের শেষাংশ আলাওলের নয়।

১৩.৫। পদ্মাবতী কাব্যের রসবিচার ও পরিণামগত অনৌচিত্য

মূলানুযায়ী আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে আছে পৃথক রসের দুটি প্লট— একটিতে আছে নাগমতি-পদ্মাবতী-রত্নসেনের মিলনান্ত কাহিনী যাতে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেমের রোমান্স; অপরটি রত্নসেন-আলাউদ্দীন-পদ্মাবতীর ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী যাতে মুখ্য হয়েছে যুদ্ধের উত্তেজনা। শেষের কাহিনীটি মূলে ট্রাজিক কিন্তু আলাওলের অনুবাদে তা মেলোড্রামায় পরিণত। আলাওলের কাহিনীটি নিম্নরূপ—

সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর প্রিয় শুকপাখীর নাম হীরামণি। রাজরোষে সে বনে পলায়ন করলে পলাতক পাখীটিকে এক ব্যাধ ধরে, ব্রাহ্মণকে হাটে বিক্রী করল। ব্রাহ্মণ এই বেতজ্ঞ পাখীকে চিতোরের রাজা রত্নসেনকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে দিয়েদিলেন। রাজরাণী নাগমতির প্রশ্নের উত্তরে হীরামণি পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা করলে পাখীটিকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা হয় কিন্তু ধাত্রী তাকে বাঁচিয়ে রেখে অবশেষে রাজার হস্তে সমর্পণ করে। রাজা পাখীর মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে যোগীবেশে ষোলশো অনুচর নিয়ে সিংহলে যাত্রা করলেন। শ্রীক্ষেত্রে উড়িষ্যাপতি গজপতি রত্নসেনকে বহিত্র দিলেন। সিংহলে এসে হীরামণির দৌত্যে মহাদেব মন্দিরেপদ্মাবতীর সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হল। রাজা তৎক্ষণাৎ প্রণয়মূর্চ্ছিত হলেন। চেতনালাভ করে রাজা গোপনে অনুচরসহ সিংহল গড়ে প্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়লে সিংহলের রাজা গন্ধর্বসেন তাঁকে শূলে দেবার আদেশ দিলেন। অবশেষে চিতোরের ভাটের মুখে রাজার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে রাজসভায় নানাবিধ পরীক্ষার পর সংশয়মুক্ত সিংহলরাজ চিতোররাজ রত্নসেনকে পদ্মাবতীর পতিরূপে সাদরে গ্রহণ করলেন। বিবাহের পর পদ্মাবতীর সঙ্গে একবছর সম্ভোবগসুখে কাটিয়ে অবশেষে পক্ষীমুখে নাগমতির বিরহসংবাদ কর্ণগোচর হলে রত্নসেন পদ্মাবতীকে নিয়ে চিতোরের দিকে যাত্রা করলন। স্বদেশে ফেরার সময় নিজের অহঙ্কারের জন্য রাজা সমুদ্র কর্তৃক বিপর্যস্ত হলেন, অবশেষে বহু দুর্যোগ ও দুর্বিপাক উত্তীর্ণ রত্নসেনের দেশে প্রত্যাবর্তন এবং মানিনী নাগমতিকে

তুষ্ট করে দুই পত্নীর সঙ্গে রাজা সুখে জীবন কাটাতে লাগলেন। এইখানে পদনমাবতীকাব্যের প্রথম পর্বের মিলনান্তক সমাপ্তি। এই পালাটিতে আছে রূপ কথাধর্মী রোমান্স ও কমেডির সুর। বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও নায়ক নায়িকার প্রেমের সার্থকতা এক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে।

মন্তব্য

পদ্মাবতী কাব্যের দ্বিতীয় প্লটের সুর ট্রাজিক, এবং কাহিনীটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক না হলেও ইতিহাসকেন্দ্রিক। এই অংশে আছে বীরত্ব ও যুদ্ধবিগ্রহের উত্তেজনা। সিংহল রাজকন্যার সঙ্গে চিতোররাজের রোমান্টিক মিলনের বিঘ্নস্বরূপ উভয়ের প্রণয়লীলার মাঝখানে শোনা গেল দিল্লীশ্বরের সেনাবাহিনীর অশ্বক্ষুরধ্বনি— ফলে ব্যক্তিগত প্রেমকাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিতে বিরাট বিস্তৃতি লাভ করল। জায়সীকে অনুসরণ করেই যদিও এই কাহিনিপর্বটি রচিত তবুও মূলের সঙ্গে অনূদিত উপাখ্যান ভাগের শেষাংশের পার্থক্য আছে।

প্রতিপদের রাত্রে দ্বিতীয়বার চাঁদ দেখিয়ে রাজাকে প্রতারণার অপরাধে রাঘবচেতন চিতোরের রাজসভা থেকে বিতাড়িত হল। নির্বাসিত রাঘব চেতন পদ্মাবতী প্রদত্ত কঙ্কন নিয়ে দিল্লীতে সুলতান আলাউদ্দীনের রাজসভায় এসে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করে সুলতানকে উন্মত্ত করে তুলল। আলাউদ্দীন পদ্মাবতীকে দাবী করে শ্রীজাকে পাঠলেন রত্নসেনের রাজসভায়। রত্নসেন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ক্রুদ্ধ সুলতান সসৈন্যে চিতোরে এসে আটবছর অবরোধ করেও রাজধারী অধিকার করতে পারলেন না। অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করে রত্নসেনের আমন্ত্রণে সুলতান চিতোরে প্রবেশ করলেন। রাজার সঙ্গে পাশা খেলার সময় হঠাৎ মুকুরে প্রতিফলিত পদ্মাবতীর রূপ দেখে সুলতান মোহিত হলেন। অতঃপর সন্ধির সর্তভঙ্গ করে আলাউদ্দীন দিল্লী প্রত্যাবর্তন কালে রত্নসেনকে বন্দী করে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে কুম্ভলনের রাজা দেবপাল এবং সুলতান স্বয়ং রত্নসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে পদ্মাবতীর কাছে নিজ নিজ দূতী পাঠলেন কিন্তু উভয়েই পদ্মাবতীকে কবলস্থ করতে ব্যর্থ হলেন। এরপর পদ্মাবতীর অনুরোধে গোরা ও বাদল নামক রাজপুত সেনাপতিদ্বয় দিল্লীতে গিয়ে কৌশল করে রাজা রত্নসেনকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। ষোলোশো পাল্কীতে ষোলোশো রাজপুত যোদ্ধা রমণীর ছদ্মবেশে দিল্লীতে প্রবেশ করে রত্নসেনের সঙ্গে সখীসহ পদ্মাবতীর সাক্ষাতের অছিলায় রাজাকে মুক্ত করে চিতোরে ফিরে এল। পশ্চাদ্ধাবিত সুলতানী

মন্তব্য

সেনার সঙ্গে যুদ্ধে গোরা অশেষ বীরত্ব দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত নিহত হল।

আলাওলের কাহিনী এ পর্যন্ত মোটামুটি জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের বিশ্বস্ত অনুসরণ। কিন্তু এরপর থেকে কাহিনীর শেষভাবে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। চিতোরে ফিরে দেবপালের দূরভিসন্ধির কথা পদ্মাবতীর মুখে শুনে ক্রুদ্ধ রত্নসেন দেবপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। দ্বৈরথদ্বন্দ্বে রত্নসেন আহত এবং দেবপাল নিহত হলেন। বিষাক্ত দেহ নিয়ে রত্নসেন চিতোরে ফিরে এসে আরও কিছু বছর বেঁচে রইলেন। ইতিমধ্যে পদ্মাবতীর গর্ভে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামে রত্নসেনের দুই পুত্র জন্মাল। চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনের যখন সাতবছর ও পাঁচ বছর বয়স তখন বিষপ্রকোপে রত্নসেনের মৃত্যু হল। নাগমতি ও পদ্মাবতী স্বামীর চিতায় 'সতী' হলেন। চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন পিতৃনির্দেশ অনুযায়ী সুলতান আলাউদ্দীনের বশ্যতা স্বীকার করলেন। সেনাপতি বাদলের সঙ্গে রাজপুত্রদ্বয় দিল্লীতে এসে সুলতানকে পিতার মৃত্যু সংবাদ জানালে দুঃখিত আলাউদ্দীন রাজকুমারদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন এবং দুজনের একজনকে চন্দ্রেয়ী অন্যজনকে মাড়োয়া রাজ্য দান করলেন। গোরা যেসব রাজ্যকে যুদ্ধে বধ করেছিল তাদের রাজ্য বাদলকে দিলেন। অতঃপর বারো বছর চিতোরে গিয়ে রাজকুমারদের সঙ্গে বাস করে অবশেষে সুলতান দিল্লী প্রস্থান করলেন। কাব্যের শেষে জায়সীর অনুসরণে জগৎ ও জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কে বিলাপ আছে।

জায়সীর উপাখ্যানের শেষাংশ এবং আলাওলের কাহিনীর সমাপ্তি অংশের মধ্যে বিপুল প্রভেদ। এই পার্থক্য দেখে কোনো কোনো গবেষক শেষাংশ আলাওলের রচনা নয় বলে সিদ্ধান্ত করছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শেষাংশ আলাওলের রচনা বলেই ধরে নিতে হবে। উভয় কবির কাব্য পরিণামের এই পার্থক্যের কারণ সম্ভবত কবিদ্বয়ের জীবনদর্শনের ভিন্নতা। জায়সী ছিলেন সাধক কবি। সুফীসাধক হিসাবে জগৎ ও জীবনের নশ্বরতাই তিনি তাঁর কাব্যে দেখিয়েছেন। অপরদিকে ধর্মমতে সুফী হয়েও আলাওল ছিলেন জীবনরসিক কবি। জীবনভোগের তত্ত্বই আলাওলের জীবনদর্শন। সেইজন্যে রত্নসেন দেবপালের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে দেশে ফিরে এসেও আরও বারোবছর বেঁচে রইলে নাগমতি ও পদ্মাবতীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করে দুই পুত্রের জনক হবার জন্য— জীবনভোগের এতখানি বিস্তৃত অবসর আলাওল রাজাকে দিয়েছেন। কেবল রাজা রত্নসেন নয়, আলাওলের হাতে

সেনাপতি বাদলও বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছে। মূল কাব্যের উপসংহারে দেশের জন্য যুদ্ধ করে বাদলের শহীদ হবার গৌরব বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু গমনার সঙ্গে প্রথম পত্নী-সম্ভাষণের মুহূর্তে বাদলকে রত্নসেন উদ্ধারের জন্য রণক্ষেত্রে চলে আসতে হয়েছিল সেইজন্য গোরা নিহত হলেও বাদলকে বাঁচিয়ে রেখে উপহৃত রাজ্য ও পত্নীসহ জীবন উপভোগের অবকাশ তাকে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসে রত্নসেনের পুত্রদের কোনো প্রসঙ্গ নেই, জায়সীর কাব্যে রত্নসেনের পুত্ররূপে নাগসেন ও কমলসেনের উল্লেখ থাকলেও কবি তাদের পরিণাম নিয়ে মাথা ঘামাননি। রত্নসেন পদ্মাবতীর প্রেমাকাহিনীই তাঁর কাব্যের বিষয়, এঁদের মৃত্যুর পর সংক্ষেপে কবি এ কাব্যের ট্রাজিক পরিণাম জানিয়ে লিখেছেন—

জৌহর ভঁই সব ইস্তিরী পুরুষ ভএ সংগ্রাম।
বাদসাহ গঢ় চূরা চিতউর ভা ইসলাম।।

নারীরা সব জহরব্রত অনুষ্ঠান করলেন, পুরুষরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন, বাদশাহ দুর্গ চূর্ণ করলেন, চিতোর ইসলাম (রাজ্য) হয়ে গেল।

বাঙ্গালী কবি আলাওল সম্ভবত এই ট্রাজিক সমাপ্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি, বিশেষতঃ রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের পরিণাম এই আখ্যান কবিকে চিন্তিত করেছিল। এর ফলে কবি নিজের মতো করে রচনা করলেন এ কাব্যের অন্য এক পরিণাম যেখানে এক বৈষ্ণবীয় প্রেমের আবহাওয়ায় শত্রুতা ভুলে মুমূর্ষু রত্নসেন আলাউদ্দীনের কাছে ক্ষমাভিক্ষা জানান, রত্নসেনের পুত্রদ্বয় সুলতানের কাছে পিতার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আত্মসমর্পণ করে, সুলতান আলাউদ্দীনও সমস্ত দর্প, অহঙ্কার ও বিফলতার ক্রোধ ভুলে নিবিড় প্রেমের আত্মীয়তায় অনাধ পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্কন করে তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন এবং পরিণামগত অনৌচিত্য সত্ত্বেও সমস্ত কাব্যটি একটি মিলনান্তক পরিসমাপ্তি লাভ করে।

কাব্যকাহিনীর এই অতিনাটকীয় পরিণতির ব্যাপারে আলাওলের আদর্শবাদী মনও ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। রাজপুতের সঙ্গে আলাউদ্দীনের মৈত্রী ও প্রীতির সম্পর্কটি যেভাবে পরিশেষে দেখানো হয়েছে তা যদি বাস্তবিকই আলাওলের রচনা হয়ে থাকে তাহলে কবি যে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর স্বপ্ন দেখেছিলেন সেকথা স্বীকার করতে হয়।

মন্তব্য

১৩.৬। পদ্মাবতী রূপক না রোমান্স কাব্য

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যটি যে হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ সেই পদ্মাবৎ কাব্যের উপসংহারে এ কাব্যের রূপক তাৎপর্য উদ্ঘাটন করে বলা হয়েছে—

''আমি এর অর্থ পণ্ডিতদের শুধিয়েছি। তাঁরা বলেছেন,এর বেশী আমরা আর কিছু বুঝিনি। ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে যে চৌদ্দভুবন বর্তমান সে সবই আছে মানুষের দেহের ভিতরে। দেহ হল চিতোর, মনকে করেছি রাজা (রত্নসেন), হৃদয় হল সিংহল দেশ এবং বুদ্ধিকে জেনেছি পদ্মিনী। শুক হল পথপ্রদর্শন গুরু। গুরু বিনা এ জগতে কে পাবে নির্গুণ (ঈশ্বর)-কে। নাগমতি হল মর্ত্যাসক্তি। এতে যার মন বাঁধা পড়ে তার মুক্তি নেই। দূত রাঘব (চেতন) হল শয়তান। আর সুলতান আলাউদ্দীন মামা। এইভাবে এই প্রেমকাহিনীর বিচার কোরো। যে বুঝতে সমর্থ সে বুঝে নাও।'' (প্রথম খণ্ড, পরিশিষ্ট)।

উদ্ধৃত স্তবকটি বাস্তবিকই জায়সীর রচনা কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই রূপক বিশ্লেষণ সম্ভবত পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলেই গবেষকদের অনুমান। পূর্বোক্ত রূপকার্থ দিয়ে কাব্যটি বিচার করলে জায়সীর প্রতিপাদ্য তত্ত্বটি হল এই— শুকরূপ গুরুর নির্দেশে নাগমতিরূপ সাংসারিক বাধা অতিক্রম করে রত্নসেনরূপ মন পদ্মাবতীরূপ প্রজ্ঞর সঙ্গে সিংহলরূপ হৃদয়ে এসে মিলিত হল। অবশেষে রাঘব চেতনরূপ শয়তান এবং আলাউদ্দীনরূপ মায়ার কবল থেকে কিভাবে উভয়ে পরিত্রাণ লাভ করে মুক্তিলাভ করল এটাই এই প্রেমকাহিনীর গূঢ় তাৎপর্য।

জায়সী সুখী প্রেমতত্ত্বকে এই কাব্যের উপজীব্য করলেও আলাওল এইধরনের রূপককে প্রতিপাদ্য করে কাব্যটি রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। আলাওল তাঁর অনুবাদকর্মের মধ্যে কোথাও এই জাতীয় রূপকের কোনো ইঙ্গিত দেননি। সুফীকবি হিসাবে জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের প্রেমকথাই আলাওলকে যে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তার স্বীকারোক্তি আছে কবির আত্মবিবরণী অংশের পংক্তিতে।

রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে।।
প্রেমপুথি পদ্মাবতী রচিতে আশা এ। (পদ্মাবতী, আত্মপরিচয়, পৃ।ঃ ২৫)

জায়সীও উপসংহার খণ্ডের প্রথম স্তবকে রূপকার্যের বদলে প্রেম কাহিনীর উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন—

মন্তব্য

‘কবি মুহম্বদ এ কাহিনী রচনা করে শোনালেন। যে শুনেছে সে-ই প্রেমের জন্যে পীড়িত হয়েছে। রক্ত দিয়ে তিনি (এ কাব্য) রচনা করলেন এবং গাঢ় প্রেম নয়নাশ্রু হয়ে ভিজিয়ে দিল। আমি এই জেনে এ গান রচনা করলাম, তা যেন এ জগতে (কীর্তি) চিহ্ন হয়ে বর্তমান তাকে।’

সুতরাং মাঝে মাঝে প্রতীকের ব্যবহার এবং রূপক খচিত দোহাগুলি থাকলেও জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য আসলে মধ্যযুগের রোমান্স কাব্য, ালাওল কাব্যটিকে এইবাবেই দেখেছিলেন। এ ব্যাপারে আলাওলের ব্যক্তিগত রুচিবোধকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল পৃষ্ঠপোষকের রসবোধ। যে অমাত্যসভায় বসে আলাওল পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ শুনিয়েছিলেন সেই অমাতাবর্গ তত্ত্বকথা অপেক্ষা প্রেমকাহিনী ও যুদ্ধকাহিনীর রোমান্সরসেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। কেবল পদ্মাবতীই নয়, আলাওলের অন্যান্য আখ্যান অনুবাদগুলি এমন কি আলাওলের পূর্ববর্তী কবি দৌলত কাজির সতীময়না বা লোকরচন্দ্রারী কাব্যও পৃষ্ঠপোষক অমাত্যবৃন্দের রোমান্সরস পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই আদিষ্ট। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পরশ্রমজীবী প্রচুর অবসর পুষ্ট রাজা ও সভাসদবর্গ যুদ্ধ ও প্রেমকাহিনীর মধ্যে রোমান্সের যে উত্তেজনা সন্ধান করতেন তার মধ্যে তত্ত্বকথার বিশেষ স্থান ছিল না। আলাওল এই সামন্ততান্ত্রিক রুচির পরিবেশে কাব্যসুরা পরিবেষণ করতে বসে জায়সীর ‘পদ্মাবৎ’ কাব্যের তত্ত্বাংশকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে গিয়ে প্রেম ও যুদ্ধের রোমান্স রসকেই মুখ্য করে তুলেছেন। স্তুতি খণ্ডে যদিও জায়সীর অনুসরণে আলাওল সৃষ্টি তত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব সুখী প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, কিন্তু কাব্যকাহিনী আরম্ভ হবার পর এই সব তত্ত্বকথার পরিবর্তে কাহিনীরই মুখ্য হয়ে উঠেছে। জায়সীর কাব্য কাহিনির স্রোত ঘটনাবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে যখন সুযোগ পেয়েছে তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করেছে, রোম্যান্টি প্রেমবর্ণনার চৌপাই স্তবকগুলি প্রায়ই মিষ্টিত অনুভবের দোহাগুচ্ছে দ্বারা একত্রিত হয়ে এক অন্তর্গূঢ় তত্ত্বভাবনায় মণ্ডত হয়েছে; সেক্ষেত্র আলাওলের অনুবাদ জায়সীর গূড়ার্থবাচক দোহাগুলিকে এবং স্বার্থবোধন শব্দগুলিকে বর্জন করে ঘটনার গতিকেই অনুসরণ করেছে। এ ব্যাপারে মাগন ঠাকুরের উৎসুক্যও কাব্যপাঠ করতে গিয়ে বেশ টের পাওয়া যায়। কাব্যের মাঝে মাঝেই পৃষ্ঠপোষক মাগন কবিকে পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তাঁর

মন্তব্য

আগ্রহ জ্ঞাপন করেছেন এবং কবিকে সত্বর বর্ণনা শেষ করতে তাড়া দিয়েছেন। সুতরা মাগন ঠাকুরের বিদগ্ধ অমাত্যসভায় আলাওলের রত্নসেনের সফল প্রণয়-অভিযান এবং চিতোর রাজবধূ পদ্মাবতী লাভের উদ্দেশ্যে দিল্লীশ্বর সুলতান আলাউদ্দীনের বিফল যুদ্ধাভিযান বর্ণনা করে উদ্দাম জীবনের উত্তেজনাকর রোমান্স রস সৃষ্টি এ কাব্যের উদ্দেশ্য। কাব্যের প্রথম পর্বে আছে রূপকথাধর্মী রোমান্স এবং দ্বিতীয় পর্বে আছে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স। কাব্যের প্রথমে জায়সীর অনুসরণে সৃষ্টিতত্ত্ব ও রসুলবন্দনা প্রভৃতি তাত্তিক ব্যাপার পরবর্তী কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।।

লোক কথা, মহাকাব্য কাহিনী অথবা ঐতিহাসিক উপাখ্যান অবলম্বনে মধ্যযুগে সবদেশেই লেখা হত রোমান্স জাতীয় সাহিত্য। প্রেমঅথবা যুদ্ধঘটনা অবলম্বনে রচিত উৎকেন্দ্রিক কল্পনারঞ্জিত অবিশ্বাস্য ও অবিন্যস্ত ঘটনা সম্বলিত একঘেয়ে বর্ণনা ছিল মধ্যযুগীয় রোমান্স সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। এখানকার নায়ক নায়িকারা সমাজের উপরের তলার মানুষ। নায়িকার অন্বেষণে নায়কের দুঃসাহসিক অভিযান, নরনারীর রোমান্টিক প্রেম এবং সেই প্রেম নিয়ে নায়কদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং যুদ্ধ এই রোমান্স সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। মালিক মুহম্মদ জায়সী মাঝে মাঝে তত্ত্বকথার সন্নিবেশ করে ‘পদ্মাবৎ’ কাব্যের প্রথম পর্বে রূপকথাশ্রয়ী রোমান্স এবং দ্বিতীয়পর্বে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের যে বর্ণনা বৈভব সৃষ্টি করেছিলেন তাকেই আলাওল বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। জায়সীর ‘পদ্মাবৎ’ কাব্যে দুর্গাশ্রিত দরবারী প্রেম যে রোমান্সরস সৃষ্টি করেছে তা রচনারীতিতে ধ্রুপদী হলেও কবিভাবনায় অনেকক্ষেত্রেই রোমান্টিক। নখশিখখন্ডের বর্ণনায় কিংবা পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ডে রত্নসেনের কাছে শুক পক্ষীর অথবা আলাউদ্দীনের কাছে রাঘবচেতনের পদ্মিনী রূপবর্ণনার মধ্যে রোমান্স রসের সন্ধান মিলবে। পদ্মাবতী লাভের জন্য হুকপক্ষীর সহায়তায় রত্নসেনের দুঃসাহসিক সমুদ্রাভিযান, আবার পদ্মাবতীকে নিয়ে রত্নসেনের সমুদ্রপথে প্রত্যাবর্তনকালে আকস্মিক তরণী-নিমজ্জন এবং সমুদ্রকন্যার আনুকূল্যে উভয়ের পুনরায় সাক্ষাৎ ও অলৌকিকভাবে পুনরুদ্ধার— সবই রূপকথাধর্মী অসম্ভব ঘটনার রোমান্স কল্পনারূপেই বিবেচ্য। রাঘব চেতনের মুখে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা শুনে সুলতানের রূপমোহ, অসংখ্য সৈন্য নিয়ে আলাউদ্দীনের পদ্মাবতী অভিযান, দীর্ঘকাল চিতোর অবরোধের পর সন্ধির সুযোগ নায়িকার মুকুর-প্রতিবিম্বিত রূপ দর্শনে সুলতানের

সংজ্ঞাহীনতা ও অকস্মাৎ রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাসনির্ভর মধ্যযুগীয় রোমান্স কল্পনার চমৎকার নিদর্শন। রোমান্সের উৎকেন্দ্রিক কল্পনা অনেক সময়ই সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা মানে না। রাজপুত রমণীর ছদ্মবেশে রাজপুত সেনা নিয়েগোরাবাদল কর্ত্তৃক দিল্লীর পাঠান কারাগার থেকে রত্নসেন-উদ্ধার বৃত্তান্ত রোমান্সের অতিনাটকীয় ঘটনাবিবরণের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। মধ্যযুগের রোমান্সে যে বীরত্বপূর্ণ দ্বৈতযুদ্ধের বর্ণনা করা যায় মূলে তার দৃষ্টান্ত আছে সরজা ও গোরার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গোরার মৃত্যুতে এবং দেবপাল ও রত্নসেনের যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় দেবপালের নিধন ও রত্নসেনের আহত হওয়ার বৃত্তান্তে। রোমান্সের মধ্যে যে অলৌকিক ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত পদ্মাবৎ কাব্যে আছে। রত্নসেনের পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য ভাট ও ভাটিনীর ছদ্মবেশে হরপার্বতীর মর্ত্যে আগমন, অথবা রত্নসেনকে পরীক্ষা করার জন্যে ছদ্মবেশী সমুদ্রের আবির্ভাব এবং সংজ্ঞাহীন মুমূর্ষ পদ্মাবতীকে সমুদ্রকন্যার শুশ্রুষা ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনা বাস্তব ও অবাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করে কাহিনীটিকে রূপকথাধর্মী রোমান্সের রাজ্যে যেমন নিয়ে গেছে তেমনি শুকপাখীর মধ্যে যে গুরু-তত্ত্বই থাক, নায়ক ও নায়িকার মধ্যে তার সংবাদ পরিবহনের দৌতকার্যটি রোমান্স লক্ষণকেই সূচিত করেছে। জায়সীর এই মধ্যযুগীয় রোমান্স কাব্যটিকে অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল অবশ্য নিজের কবিস্বভাব অনুযায়ী মূল কাব্যটিকে কাব্যলক্ষণের ক্ষেত্রে যে কিছুটা পরিবর্তিত করেছেন সে সম্পর্কে সন্দহে নেই। বর্ণনার ক্ষেত্রে ধ্রুপদীভঙ্গীকে অনুসরণ করলেও কবিদৃষ্টিতে জায়সী ছিলেন কিছুটা রোমান্টিক এবং অনেকখানি মিষ্টিক। অপরদিকে সুফী ধর্মাবলম্বী হলেও অনুবাদক হিসাবে আলওল ছিলেন অনেকখানি বাস্তববাদী ও সামাজিক। বর্ণনাগুণে জায়সীর রোমান্স কাব্যে একদিকে আছে মহাকাব্যধর্মী বিস্তৃতি এবং ব্যঞ্জনাগুণে দেখা দিয়েছে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য— কিন্তু আলাওলের অনুবাদে অনেকক্ষেত্রে মহাকাব্যিক বিস্তার এবং আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা হ্রাস পেয়ে বাস্তবধর্মী ঘটনার তথ্যবিবরণে পর্যবসিত হয়েছে। পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডে যেখানে আলাওল জায়সীকে এড়িয়ে গিয়ে মৌলিকতা দেখবার চেষ্টা করেছেন সেই খণ্ডটি লক্ষ করলেই উভয়ের রচনা প্রভেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিবাহখণ্ডে জায়সী বিবাহের লোকাচারকে গৌণ করে ও নায়ক নায়িকার প্রেমাবেগময় হলদয়কেই মুখ্য করে সূর্য ও চন্দ্রের প্রতীকে যে রোমান্স রস রচনা করেছেন, আলাওল

মন্তব্য

সেখানে বঙ্গীয় বিবাহপ্রথার খুঁটিনাটি বাস্তবধর্মী বর্ণনার দ্বারা হিন্দুবিবাহের সামাজিক আচার আচরণের প্রতি যতোটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিনিবেশ দেখিয়েছেন নায়ক নায়িকার হৃদয়ঘটিত রোমান্সরসের প্রতি ততটা আগ্রহ দেখাননি। রোমান্সের অলৌকক ঘটনা সংস্থানের প্রতিও আলাওলের বিশেষ আস্থা ছিল না; জায়সীর অনুবাদ করতে বসে তিনি যদিও পার্বতী মহেশ খণ্ডটিকে অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু জায়সীর মতো রত্নসেনের পরিচয়দাতা ভাটকে ছদ্মবেশী মহেশ্বর রূপে দেখাননি, তাকে বাস্তবিক চিতোরের ভোট বলেই বর্ণনা করেছে। রোমান্স রসের মধ্যে সে বিস্ময়রস থাকে, যাকে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রস প্রসঙ্গে 'চিত্তবিস্ফারক দূরত্ববোধ' বলে অভিহিত করেছেন তা জায়সীর মধ্যে যতখানি ছিল ালাওলের মধ্যে ততখানি ছিল না। পদ্মাবতীর জন্য সমুদ্র অভিযান বর্ণনায়জায়সী সপ্তসমুদ্রের রূপকের মধ্যেও যে নৈসর্গিক রোমান্স রস সৃষ্টি করেছেন আলাওলের বর্ণনায় তা নেই। জায়সীর সুবিখ্যাত নাগমতির বারমাসীতে কি নিসর্গ বর্ণনায়, কি রমণী হলদয় বর্ণনায় এদিকে মিষ্টিক রহস্যবোধ এবং অপরদিকে বেদনার নিসর্গব্যাপ্ত রূপ যে অসাধারণ রোমান্স রসসিদ্ধি অর্জন করেছে মঙ্গলকাব্যের অনুসারক আলাওলের রচনায় তা নীরস তথ্যপুঞ্জে আকীর্ণ হওয়ায় সেই সাফল্য আসেনি। মুকুরে প্রতিফলিত পদ্মাবতীর রূপ দেখে সুলতানের সুগভীর বিস্ময়রসের রোমান্স অতীন্দ্রিয় রহস্যবোধর ইসারায় জায়সীর কাব্যে যে প্রতীক দ্যোতনা লাভ করেছে, আলাওলের অনুবাদে তা নিছক ঘটনা বিবৃতির মাত্রাকে অতিক্রম করে এক পাও অগ্রসর হতে পারেনি। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য যেখানে মধ্যযুগের এক অসামান্য রূপকখচিত মহাকাব্যধর্মী রোমান্স, আলাওলের অনুবাদ সেক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় রোমান্সের বস্তুধর্মী আখ্যানবিবলতি ছাড়া ার বেশী কিছু নয়।

১৩.৭। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। পদ্মাবতী কাব্যের কবি সৈয়দ আলাওলের কবি পরিচিতি উল্লেখ করো।

২। পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনি প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো।

৩। পদ্মাবতী কাব্যে মাগন প্রসঙ্গ ও মাগন পরিচয় উল্লেখ করো।

৪। পদ্মাবতী কাব্যের উৎস বিচার করো।

৫। পদ্মাবতী রস বিচার ও পরিণামগত অনৌচিত্য বিচার করো।

৬। পদ্মাবতী রূপক না রোমান্স কাব্য উল্লেখ করো।

১৩.৮। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - দেবেশ আচার্য।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীমন্ত কুমার জানা (অখণ্ড)

৩। পদ্মাবতী সম্পাদনায় - দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)।

মন্তব্য

একক - ১৪ আলাওলের ধর্মবোধ ও পদ্মাবতী কাব্যে সুফী প্রভাব, কাব্যের ঐতিহাসিকতা, পদ্মাবতী কাব্যের ভাষা ও ছন্দ, সমাজ সংস্কৃতি, পদমাবৎ ও পদ্মাবতীর তুলনা, পদ্মাবতী কাব্যে গান।

বিন্যাসক্রম —

১৪.১। আলাওলের ধর্মবোধ ও পদ্মাবতী কাব্যে সুফী প্রভাব,

১৪.২।পদ্মাবতী কাব্যের ঐতিহাসিকতা

১৪.৩। পদ্মাবতী কাব্যের ভাষা ও ছন্দ, সমাজ সংস্কৃতি

১৪.৪। অনুবাদক হিসেবে মালিক মুহম্মদ জায়গীর

১৪.৫। আলাওলের পদ্মাবতীর তুলনা

১৪.৬। জায়গীর পদ্মাবৎ কাব্য আসলে চৌপাই ও দোহার মিলিত পদগীতি

১৪.৭। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১৪.৮। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১৪.১। আলাওলের ধর্মবোধ এবং পদ্মাবতী কাব্যে সুফী প্রভাব

আলাওল ধর্মমতে ছিলেন সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত। কবি আলাওল পদ্মাবতী কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে তাঁর সুফীধর্ম ভাবনার পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

যার হৃদে জনমিল প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পায় সেই সভান ঠাকুর।।...
যার হৃদে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল।
সুখ মোক্ষ প্রাপ্তি তার আপদ তরলি।।...
প্রেম কবি আলাওল প্রভুর ভাবক।
অন্তরে প্রবল পুণ্য প্রেমের পালক।।

(আত্মপরিচয়, পৃঃ ২৩)

সুফী ধর্মদর্শনের মূলকথা হল ঈশ্বরের প্রেমে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। মানুষের মধ্যে সেই অপার্থিব প্রেম জেগে উঠলে তার হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য যে বিরহবোধ

জেগে ওঠে সেই বিরহের অগ্নিতে আত্মনাশ হলেই ভগবানের সঙেগ তার পূর্ণ মিলন এবং সেই মিলনের মধ্যেই তার মুক্তি। সুফী ধর্ম ভাবনায় প্রেম-বিরহ মোক্ষের যে ত্রিধারা তত্ত্বের কথা আছে আলাওল সেই মূল তত্ত্বকেই সংক্ষেপে আত্মবিবরণ পরিচ্ছেদের শেষদিকে বর্ণনা করেছেন। সুফীধর্মের সাধনক্ষেত্রে প্রেম-বিরহ-মোক্ষের এই সাধ্যসীমায় পৌঁছতে গেলে মুর্শিদ বা গুরুর আবশ্যক। আলাওলও আত্মবিবরণ অধ্যায়ের শেষে এই গুরুবাদী ভাবনা প্রকাশ করে লিখেছেন—

বাঞ্ছিত পূরণ হেতু গুরু পরশন।
অন্ধ চক্ষে জ্যোতি হৈল জ্ঞানের আঞ্জন।।

(আত্মপরিচয়, পৃঃ ২৪)

জায়সীর মতো আলাওল তাঁর কাব্যে পীর পরম্পরায় কোনো গুরু পরিচয় দেননি; তবে রোসাঙের কাজী সৈয়দ মসুদ যে তাঁকে 'কাদেরী খিলাফৎ' এ দীক্ষা দিয়েছিলেন 'সিকন্দরনামা' গ্রন্থের আত্মকথায় আলাওল তা এইভাবে জানিয়েছেন—

সৈয়দ মসুদ শাহা রোসাঙ্গের কাজী।
জ্ঞান অল্প আছে বুলি মোরে হৈল রাজি।।
দয়াল চরিত্র পীর অতুল মহত্ব।
কৃপা করি দিলেক কাদেরি খিলাফত।।

সুফী ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রধান চারটি শাখা— চিহ্তী, সুহ্রাবর্দী, কাদেরী এবং নক্সবন্দী। এরমধ্যে চিশতী সম্প্রদায়ই প্রাচীন। জায়সী ছিলেন চিশ্তী সম্প্রদায়ভুক্ত। কাদেরী শাখার আদিগুরু ছিলেন আব্দ আল্ কাদির অল্জীলী। তাঁর বংশীয় সৈয়দ মহম্মদ এই সম্প্রদায় শাখাটিকে ভারতে নিয়ে আসেন। ভারতীয় সুফীধর্মের অদ্বৈতবাদ, যোগাচারবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, বৈরাগ্যতত্ত্ব, নির্বাণবাদ, গুরুবাদ, লীলাবাদ, মানবপ্রেম ইত্যাদি যাবতীয় লক্ষণই কাদেরী সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছে, উপরন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়বাদী আদর্শ লক্ষ করা যায়। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক মীয়া মীরের প্রতি দারা শিকোহ্ একান্ত অনুরাগী ছিলেন। পরে অবশ্য এই সম্প্রদায় কিছুটা রক্ষণশীল হয়ে ওঠে।

পদ্মাবতী কাব্যের স্তুতিখণ্ডটিতে আলাওল খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে জায়সীর পদ্মাবৎ

মন্তব্য

কাব্যের অস্তুতিখণ্ডের অনুসরণ করেছেন। এই খণ্ডের অন্তর্গত মুহম্মদ-প্রশস্তি সম্পর্কিত অতিরিক্ত স্তবকটি ছাড়া অন্য বক্তব্যগুলি জায়সীর ঈশ্বর ভাবনারই অনুসৃতিমাত্র। সুতরাং উক্ত স্তুতিখণ্ডটিতে কোরাণ ও হাদিস অনুসরণে সৃষ্টিতত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব এবং মহম্মদ ও তাঁর বন্ধুসম্পর্কিত যে স্তুতিকথা আছে তা আসলে জায়সীরই অনুবাদ। তবে সুফী কবিরূপে জায়সী ও আলাওল উভয়েরই ধর্মভাবনার সাধারণ লক্ষণগুলি উক্তর স্তুতিখণ্ডের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কেবল পদ্মাবত কাব্যেই নয়, অখরাবট এবং আখিরিকলাম গ্রন্থের প্রথমে জয়সী যেমন তাঁর ঈশ্বর ভাবনা প্রকাশ করেছেন, আলাওলও তাঁর প্রায় সমস্ত কাব্যের প্রথমে স্তুতি ও বন্দনা দিয়েই কাব্য শুরু করেছেন। পদ্মাবতী কাব্যের স্তুতখণ্ডে জায়সীর অনুসরণে আলাওল যেমন সুফীধর্মের সর্বেশ্বরবাদ ও লীলাবাদ প্রকাশ করেছেন তেমনি সপ্তপয়কর গ্রন্থের প্রথমেও অনুরূপভাবে ঈশ্বরকে জ্যোতিস্রষ্টা রূপে কল্পনা করে জগৎ সংসারকে তাঁরই পররকাশ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আলাওলের সুফী ধর্মভাবনার প্রকাশরূপে পূর্বোক্ত দুখানি কাব্য থেকে দুটি দৃষ্টান্ত পাশাপাশি রাখলেই কবির ধর্মচেতনার ঐক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আদিতে সৃষ্টি ছিল তমোময়, নিরাকার ঈশ্বরের ইঙ্গিতেই তা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল— কোরাণ কথিত সৃষ্টিতত্ত্বের এই বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আলাওলের দুটি কাব্যের প্রথমে—

পদ্মাবীতী— পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেস্ত নিররূপ করিতে প্রচার।।
নিজ সখা মুহম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই সে জ্যোতির মূলে ভুবন নির্মিলা।।

(পদ্মাবতী, স্তুততখণ্ড, পৃঃ ৭)

সপ্তপয়কর— আদ্যেত নিরূপ ছিল প্রভু নিরাকার
চেতন স্বরূপ যদি হইল প্রচার।।
অতিঘোর তমময় আকার বর্জিত।
মহাজ্যোতির্ময় হৈল ঈশ্বর ইঙ্গিত।।
জ্যোতির সমুদ্রে আদ্য নূর মহম্মদ।
জগৎ বিজয়ী হস্তে পাইল সম্পদ।।

পদ্মাবতী কাব্যের প্রথমে জায়সীর প্রথম দশটি স্তবকের অনুসরণে আলাওল যে ঈশ্বরস্তুতি করেছেন তার মধ্যে ইসলামী একেশ্বরবাদ ও ভারতীয় সর্বেশ্বরবাদের পাশাপাশি সুফী ধর্মের লীলাবাদও স্থান পেয়েছে। যে স্তবকটি আলাওলের স্বাধীন রচনা তার মধ্যে কৃপাময় ঈশ্বরের লীলা বর্ণনায় কবি অক্ষমতা জ্ঞাপন করে লিখেছেন— মন্তব্য

বর্ণন না যায় যার সৃজন অপার।
কেমনে বর্ণিব সেই সৃজন তাহার।।
বুদ্ধির প্রকাশ মোর ততদূর নাই।
অন্তত কেমনে তোর করিব গোঁসাই।।

(পদ্মাবতী স্তুতিখণ্ড, পৃ: ৬)

যিনি একেশ্বর ও সর্বেশ্বর নিরাকার ঈশ্বর, তিনিই আবার প্রেমে ও লীলায় 'গোঁসাই', কবি লীলাবাদী বৈষ্ণবীয় ভাবনায় জায়সীর নিরাকার ঈশ্বরকে শুধু স্মরণ করেননি, প্রণামও করেছেন।

আলাওল ধর্মবিশ্বাসে সুফী মতাবলম্বী হলেও জায়সীর মতো সুফী সাধক ছিলেন না। জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্যে কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে দোহগুলির মধেয সুফীভাবনার যে তত্ত্বকণাগুলি ছড়িয়ে আছে অনুবাদকালে আলাওল সেগুলি অনেকক্ষেত্রে বর্জন করেছেন। এর ফলে জায়সীর কাব্যের প্রতীকীগুণ আলাওলের কাব্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। পদ্মাবৎ কাব্যের শেযে পরিশিষ্ট স্তবকে মূল কাহিনীর যে রূপক বিশ্লেষণ আছে তা যদি সত্যিই জায়সীর প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে থাকে, আলাওল তাঁর অনুবাদে সেই রূপকাত্মকতা রক্ষা করেননি। সুফী কবিরূপে জায়সী তাঁর কাব্যের প্রথমে রত্নসেন পদ্মাবতীর মিলনের মধ্যে সুফী প্রেমপন্থাকে অবলম্বন করলেও শেষপর্যন্ত কাব্যের উপসংহারে জগতের নশ্বরতাকে প্রমাণ করেছেন। একই চিতাশয্যায় রত্নসেন ও পদ্মাবতীর মৃত্যুমুক্তি এবং পদ্মাবতীকে না পেয়ে এক মুঠো ধুলো হাতে নিয়ে 'এ জগৎ মিথ্যা' বলে সুলতান কর্ত্তৃক তা বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া— নশ্বরতাবাদী সুফীভাবনারই প্রতীক রূপ বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে রত্নসেন-পদ্মাবতীর মৃত্যু এবং জীবন ও জগতের এই নশ্বরতার কথা শেযে থাকলেও আলাওল ছিলেন মূলত জীবনরসিক কবি। তত্ত্বরস অপেক্ষা জীবন রসই আলাওলকে

মন্তব্য

বেশী আকর্ষণ করেছিল। যে অমাত্য সভার পরিবেশে কবি পদ্মাবৎ কাবেযর অনুবাদ করেছিলেন সেখানকার আবহাওয়ায় তত্ত্বরস অপেক্ষা রোমান্সরসই বেশী উপযোগী। তত্ত্বকথা অপেক্ষা প্রণয়কথাই যে কবির লেখনীকে সরস করেছিল তার স্বীকারোক্তি আছে আলাওলের আত্মবিবরণের পংক্তিতে—

রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে।।

প্রেম পুথি পদ্মাবতী রচিতে আশা এ।

জায়সীর পদ্মাবতের অনুসরণ করলেও আলাওলের কাব্য পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। মাগন ঠাকুরের বিদগ্ধ অমাত্যসভায় আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যপরিবেষণের মুখ্য উদ্দেশ্য কোনো তত্ত্বপ্রচার নয়, সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর জন্য যোগীর ছদ্মবেশে চিতোররাজ রত্নসেনের সফল প্রণয়-অভিযান এবং চিতোররাজবধূ পদ্মাবতী লাভের উদ্দেশ্যে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের বিফল যুদ্ধাভিযান বর্ণনা করে উদ্দাম জীবনের উত্তেজনাকর রোমান্সরস সৃষ্টিই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। কাব্যের প্রথমে স্তুতিখণ্ড অধ্যায়ে জায়সীর অনুসরণে সৃষ্টিতত্ত্ব ও রসুলবন্দনা প্রভৃতি ব্যাপার সম্পূর্র বহিরঙ্গ, মূল কাব্যকাহিনীর সঙ্গে পদ্মাবতের মতো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত নয়।

সুফী সাধক জায়সীর সঙ্গে জীবনরসিক আলাওলের জীবনদর্শনের পার্থক্যের জন্য উভয় কাব্যের উপসংহারের মধ্যে লক্ষণীয় পার্তক্য দেখা দিয়েছে। নশ্বরতাবাদী জায়সীর কাব্যে সুফী ফনাতত্ত্বকে প্রতিপন্ন করতে গেলে রত্নসেনের সত্ত্বর মৃত্যুই আবশ্যক। কিন্তু জীবন ভোগই যেহেতু আলাওলের জীবনদর্শন সেইজন্য দেবপালের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়েও রত্নসেন আরও দীর্ঘকাল বেঁচে রইলেন পদ্মাবতী ও নাগমতির সঙ্গে দাম্পত্য জীবনযাপন করে দুই জনক হবার জন্য এবং বাদলকেও শহীদ হতে না দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হল পত্নীসহ রাজ্যভোগ করার জন্য। সুফীধর্মের অধ্যাত্মপ্রেম অপেক্ষা জীবনপ্রেমই আলাওলকে অধিকতর আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও পদ্মাবতী কাব্য থেকে সুফীধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না। আলাওলের পদ্মাবতী কাহিনীর মধ্যে মধ্যযুগীয় রোমান্সের মানবিক উপকরণ সত্ত্বেও এ কাব্যকে সম্পূর্ণ সেক্যুলার বা ধর্মভাববিবর্জিত বলা চলে না। মূল কাব্যকাহিনীর মধ্যে মাঝে মাঝেই সুফীধর্মের মেন সব রহস্যবাদ (mysticism) উঁকি দিয়েছে যে আলাওলের অনুবাদে অনেক ক্ষেত্রেই তা ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া মধ্যযুগের কবিরূপে ধর্মভাবের প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা

জায়সী ও আলাওল কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। এর ফলে এ কাব্যের প্রথম পর্বে রত্নসেন- পদ্মাবতীর মিলনকে সহজ ও সংকটোত্তীর্ণ করার জন্য ঘটনার বিপন্ন মুহূর্তে অলৌকিকভাবে হর-পার্বতীর সাহায্য নিতে হয়েছে,— সুফীধর্মের উদরতার জন্যই মুসলিম কবির পক্ষে হিন্দু দেবতার কাছ থেকে এই জাতীয় সাহায্য গ্রহণ সম্ভবপর হয়েছে। আবার রত্নসেনের প্রেমের একনিষ্ঠতার প্রমাণ স্বরূপ মূল ও অনুবাদে দুবার দুটি অলৌকিক দেবলীলার অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমবার পার্বতী মহেশ খণ্ডে ছদ্মবেশিনী পার্বতীর ছলনা, আর দ্বিতীয়বার লক্ষী সমুদ্র খণ্ডে ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীর ছলনা, — উভয়ক্ষেত্রেই প্রেমের এবং সত্যের জোরে দৈবী ছলনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে রত্নসেন তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমকেই প্রমাণ করেছেন। প্রেমই সুফীধর্মের মূল কথা; যে প্রেম সাধনালব্ধ, যে প্রেমের জন্য মানুষ অক্লেশে আত্মোসর্গ করতে যায় সেই প্রেম অসাধ্য সাধন করতে পারে। জায়সীর কাব্য অবলম্বনে আলাওলও সেই প্রেমকেই এ কাব্যের উপীজীব্য করেছেন। যে প্রেম নায়িকার রূপশ্রবণে ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠে নায়ককে যোগী করে এবং দুঃসাহিক অভিযানে ও অসমসাহসিক আত্মোৎসর্গে প্রবৃত্ত করে সেই প্রেম অবশেষে মিলনে সার্তক হয়, আর যে রূপোন্মত্ত প্রেম সাধনা ব্যতিরেকে কেবল ক্ষমতার দর্পে পরস্ত্রীকে কামনা করে সেই মদমত্ত বাসনা শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে জগতের নশ্বরতাকেই অনুভব করে— জায়সীর এই মহৎ উপলব্ধিকে বাংলা কাব্যে রূপান্তরিত করতে গিয়ে আলাওল এর অনেক প্রতীক-প্রতিমাকে বিসর্জন দিলেও মূল চালচিত্রটিকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এরফলে যেমন প্রেমখণ্ডের মধ্যে বিরহভাবাক্রান্ত সুফী প্রেমতত্ত্বের আভাস আছে—

প্রেম রূপ রূপ প্রেম বিরহের মূল।
অমৃত অমিয়া রস করিল আকুল।।

তেমনি যোগী খণ্ডের মধ্যে কেটি স্বতন্ত্র স্তবক জুড়ে আলাওল যোগাচার ধর্মের যে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন তা সুফী যোগতত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। সুফী ধর্ম যখন ভারতে এসে প্রবেশ করল তখন একদিকে তা যেমন অদ্বৈত বেদান্তের দ্বারা প্রভাবিত হল তেমনি অপরদিকে তান্ত্রিক যোগাচারের সংস্পর্শ লাভ করল। আলাওল যোগীখণ্ডের মধ্যে রত্নসেনের যোগাচারের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তা কবির পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার ফল। তবে আলাওলের যোগতত্ত্ব প্রসঙ্গগুলি অনেকক্ষেত্রেই বহিরারোপিত

মন্তব্য

পাণ্ডিত্য প্রদর্শন, জায়সীর মতো শৃঙ্খলিথভাবে যোগতত্ত্বের উপলব্ধিগুলি এখানে ব্যক্ত হয়নি।

সুফী ধর্মাবলম্বী আলাওল সুফীধর্মের ভিতর থেকে অর্জন করেছিলেন এক উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি যার প্রভাব পড়েছে এ কাব্যের পরিণতির ক্ষেত্রে। কাদেরী সম্প্রদায়ভুক্ত আলাওলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমন্বয়বায়ী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রেম ও মৈত্রীতেই তিনি বিশ্বাসী। কোনো কোনো সমালোচক আলাওলের পদ্মাবতীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন, কেউ কেউ আবার আলাওলের উপর সাম্প্রদায়িকতাকে চাপিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এ কাব্য শেষপর্যন্ত মূলের বিরোধ ও সংঘাতকে অতিক্রম করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও শান্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ফলে মূলের ট্যাজিকে রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে বটে কিন্তু প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শ জয়যুক্ত হয়ে অনুবাদকের আদর্শবাদী মনোভাবকে প্রকাশ করেছে। জায়সীর মতোইআলাওলের কাব্যেও কোরাণ ও পুরাণ একাকার। আলাওলের কাব্যে যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার বীজ খুঁজে পেয়েছেন তারা পদ্মাবতীর কাব্যের দুটি জায়গায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি, রাজা রত্নসেন-সতী খণ্ডে পদ্মাবতীর অদর্শনে রতনসেন যেখানে উন্মত্তের মতো দেবতাকে অতিসম্পাদ দিতে গিয়ে প্রতিমাপুজার নিষ্ফলতার কথা ঘোষণা করেছে-

সেই সে পাগল যেবা পাষাণ সেবয়।
আপনা শকতে যেই নড়িতে নারয়।।
কেনে না পুজিএ এক প্রভু নৈরাকার।
জীবনে মরণে যেই করয় উদ্ধার।।
করি-পুচ্ছ ধরিলে সমুদ্র হয় পার।
ধরিলে অজার পুচ্ছ ডুবে মধ্যধার।।

(রাজা রত্নসেন-সতী খণ্ড, পৃঃ ১৯৯)

উদ্ধৃত স্তবকটি জায়সীর পদমাবৎ কাব্যের রাজা রত্নসেন-সতী খণ্ডের চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ। রত্নসেন দেবতাকে বিশ্বাসঘাতক বলে সম্বোধন করে সেখানে বলেছে— 'যে পাষাণকে পুজো করে সে পাগল।' এটা রত্নসেনের উক্তি বলেই ধরতে হবে। জায়সী বা আলাওলের নয়। কিন্তু রত্নসেনের উক্ত প্রলাপোক্তির পরে শহীদুল্লাহ সংস্করণ ও

হবিবী সংস্করণে আলাওলের রচনা বলে বঙ্গানুবাদ সহ একটি সংস্কৃত শ্লোক ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে (যা পুঁথিতে নেই) যা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার সাংঘাতিক নিদর্শন। মন্তব্য

মূর্খানাং প্রতিমা দেবো বিপ্রদেবো হুতাশনঃ।
যোগিনাং প্রার্থনা দেবো দেবদেবো নিরঞ্জনঃ।।
মূর্খ সকলেরদেব প্রতিমা সে সার।
ব্রাহ্মণ সবের দেব অগ্নি অবতার।।
যোগী সকলের দেব আপ্ত মহাজন।
সকল দেবের দেব প্রভু নিরঞ্জন।।

সারা পদ্মাবতী কাব্যে যেখানে আর কোথাও কোনো সংস্কৃত শ্লোক নেই, সেখানে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে এই সংস্কৃত শ্লোক ও তার অনুবাদ আলাওলের বলে মনে হয় না। বিশেষত ঐ পরিচ্ছেদের শেষেই একটি স্বাধীন স্তবকে আলাওল যেখানে প্রতিমা পূজার অর্থ প্রতিমার জবানীতেই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন সেক্ষেত্রেও ঐ জাতীয় সাম্প্রদায়িক শ্লোক রচনার অবকাশ কোথায়? ঐ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও অনুবাদ সম্ভবত ছাপার যুগের কীর্তি। পদ্মাবতীর কাব্যের অপর একটি স্থানে আলাওলের তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতার ইঙ্গিত লক্ষ করেছেন কালিকারঞ্জন কানুনগো প্রমুখ কোনো কোনো সমালোচক। হিন্দুকুলতিলক রত্নসেনকে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য সুলতানের দরবার থেকে হিন্দু রাজারা যখন বিদায় প্রার্থনা করছেন তখন জায়সীর আলাউদ্দীন সহাস্যে পান দিয়ে তাঁদের বিদায় দিলেন, কিন্তু আলাওলের আলাউদ্দীন তাদের বিদায় দানকালে যেকথা বললেন তা মূল বহির্ভূত অতএব অনুবাদকের সংযোজন-

মোছলমান জাতির মনেত করি আশা।
কদাচিৎ না করিল হিন্দুর ভরসা।।
দীন মহম্মদ আছে মোর শিরে ছত্র।
তাহার প্রসাদে হইব বিজয় সর্বত্র।।

(বাদশাহ আক্রমণ খণ্ড, পৃঃ ২৮৪)

কিন্তু এটাকেও আলাওলের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ভাবার কোনোই কারণ নেই, কারণ

মন্তব্য

এটা স্পষ্টতই আলাউদ্দীনের তদুচিত উক্তি। আলাওলের আলাউদ্দীনের উক্তিকে আলাওলের উক্তি বলে ভাবলে সীতারাম উপন্যাসে 'মার মার, শত্রু মার'— শ্রীর এই উক্তিকে বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ বলে বিবেচনা করতে হয়।

আলাওলের সাম্প্রদায়িক উদারতার পরিচয় মিলবে হিন্দু শাস্ত্র,পুরাণ, সংস্কৃতি সম্পর্কে আন্তরিক আগ্রহের মধ্যে। মূল 'পদ্মাবৎ' কাব্যের মধ্যে যেখানে হিন্দু মুসলমান বিরোধ ও চিতোরের পতনেই কাব্যের সমাপ্তি আলাওল সেক্ষেত্রে খিল খন্ডের মধ্যে কাব্যকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাজপুত ও সুলতানের মৈত্রী ও প্রীতির মধ্যে বিরোধের অবসান দেখিয়েছেন। এর ফলে মূল কাব্যের ট্রাজিকস বিনষ্ট হলেও রত্নসেনের পুত্রদের সঙ্গে আলাউদ্দীনের প্রেম ও শান্তি স্থাপনের মধ্যে আলওলের যে প্রেমাদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা সুফী ভাবনারই ফলশ্রুতি।

১৪.২। পদ্মাবতী কাব্যে ঐতিহাসিকতা

পৃথিবীতে ইতিহাস-কাহিনী যেমন অনেকক্ষেত্রে কাব্যের জন্ম দিয়েছে তেমনি কাব্য কাহিনীও কখনও কখনও পরবর্তী কালে ইতিহাস দেখা দিয়েছে। এমনই এক অসামান্য নিদর্শন হল পদ্মিনী-উপাখ্যান। পদ্মাবতী কবিকল্পনার সৃষ্টি, সম্ভবত হিন্দি কবি জায়সীর মানসকন্যা। সুলতান আলাউদ্দীনের চিতোর বিজয় কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও তাঁর পদ্মিনী অভিযান ইতিহাসের সত্য নয়, কবিকল্পনার সত্য। হিন্দী কদ্মাবৎ কাব্যে মালিক মুহম্মদ জায়সী এক সৌন্দর্য-প্রতিমাকে নিয়ে কাহিনী রচনার জন্য যে তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেছিলেন সেই মানবস প্রতিমাই পরবর্তীকালে ইতিহাসের নায়িকা চরিত্র হয়ে উঠেছেন। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যরচনার শতবর্ষ পরে আলাওল আরাকানে বসে যখন কাব্যদ্ভি বাংলায় অনুবাদ করছেন তার মধ্যেই বিখ্যাত-বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে পদ্মিনী-উপাখ্যান ইতিহাস কাহিনীরূপে বিখ্যাত হয়ে গেছে। ইতিহাসে পদ্মাবতী নেই, কিন্তু পদ্মাবতীর ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে, জায়সীর আগে যে সমস্ত মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাঁরা কেউই পদ্মিনী বা পদ্মাবতী প্রসঙ্গের কোনোই উল্লেখ করেননি। আলাউদ্দীনের চিতোর াভিযানের সঙ্গী আমীর খসরু থেকে আরম্ভ করে জিয়াউদ্দীন বরণী, মৌলানা, ইবন বতুতা প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ পদ্মিনী উপাখ্যান বর্জন করেই চিতোর অভিযানের ইতিহাস লিখেছেন। পদ্মিনীর জন্য আলাউদ্দীন চিতোর

জয় করলে সুলতানের সমকালীন কবি ও ঐতিহাসিক আমীর খসরু নিঃসন্দেহে তার উল্লেখ করতেন। খসরু প্রত্যক্ষদশী রূপে চিতোর যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তার থেকে আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ। মন্তব্য

সোমবার ৮ই জমাদি উসসানী হিঃ সঃ ৭০২ (অর্থাৎ ২৮শে জানুয়ারী ১৩০৩) তারিখে সুলতান আলাউদ্দীন দিল্লী থেকে সসৈন্য চিতোর অভিমুখে যাত্রা করলেন। চিতোরে উপনীত হয়ে সুলতান গম্ভেরী এবং বেরাক নদীর মধ্যবর্তী স্থলে তাঁবু গাড়লেন। অতঃপর সমস্ত দুর্গটিকে সৈন্যদল অবরোধ করল এবং সুলতান চিতোরী নামক একটি পার্বত্য টিলায় চাঁদোয়া টাঙিয়ে দরবার বসালেন এবং স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। দুর্ধর্ষ সৈন্যগণ দুর্গ আক্রমণ করল আর চিতোরের রাণা রতন সিং রাজপুত সৈন্যদের নিয়ে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। সুলতান সৈন্যদের তাঁর ও প্রস্তর বর্ষণের দ্বারা দুর্ভেদ্য চিতোর দুর্গের বিশেষ কোনো ক্ষতি হল না, এবং সুউচ্চ দুর্গে মই-এর দ্বারাও ওঠা সম্ভব ছিল না। এইভাবে সাতমাস ধরে সুলতানী আক্রমণ এবং রাজপুতদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টার পর সোমবার ১১ই মহরম ৭০৩ হিজিরায় (অর্থাৎ ২৬শে আগস্ট ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ) রাজপুত রমণীদের জহরব্রত অনুষ্ঠানের শেষে চিতোর দুর্গ বিজিত হল। (তারিখ-ই-আলাই)।

ত্রিশ হাজার রাজপুত সেনা তরবারির আঘাতে প্রাণ দিল। আমীর খসরুর বিবরণ অনুযায়ী চিতোরের রাণা রতন সিং সুলতানের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে আলাউদ্দীনের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন। ঐতিহাসিক উসামী এই বিবরর সমর্থন করেছেন, যদিও রাজপুতনার ইতিহাসে সুলতানের হাতে রতন সিংহের মৃত্যুর কথাই বর্ণিত হয়েছে। আমীর খসরুর বিবরণে চিতোর পতনের পর রতন সিং-এর আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। চিতোর বিজয়ের পর আলাউদ্দীন কয়েকদিন চিতোরে অবস্থান করে বহু মন্দির ধ্বংস করলেন, সুলতানী সৈন্যদের নির্বিচার অস্ত্রের আঘাতে বহু নিরপরাধ প্রাণ বিনষ্ট হল, অবশেষে সুলতান পুত্র খিজির খাঁর হাতে চিতোরের শাসনভার অর্পণ করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।

আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযান সম্পর্কে আমীর খসরু যতখানি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, আর কোনো সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক এত বিস্তারিত বর্ণনা দেননি। আমীর খসরু ছিলেন সুলতানের চিতোর অভিযানের সঙ্গী। সুতরাং তাঁর পক্ষে যতখানি

মন্তব্য

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ ছিল এতখানি আর কারোরই ছিল না। এযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী আলাউদ্দীনের চিতোর জয়ের বৃত্তান্ত খুবই সংক্ষেপে দিয়েছেন। তিনি তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে এটুকুই লিখেছেন ''সুলতান আলাউদ্দীন অতঃপর চিতোর অভিযানে অগ্রসর হলেন। অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি চিতোর অধিকার করলেন এবং সেখান থেকে পুনরায় দিল্লী ফিরে গেলেন।''

আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযান এবং রাণা রতন সিং-এর সঙ্গে সংঘর্ষ ও চিতোর পতনের ঐতিহাসিক ঘটনাটুকু, সম্বল করে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে জায়সী কল্পিত পদ্মাবতীকে কেন্দ্র করে রূপক ও রোমান্সের যে বিশাল রাজপ্রসাদ রচনা করলেন তা পরবর্তীকালে ইতিহাস কাহিনীতে রূপান্তরিত হল। জায়সীর কাহিনী ঈষৎ পরিবর্তত আকারে প্রথম ইতিহাসরূপে গৃহীত হল আবুল ফসলের আইন-ই-আকবরীতে এবং পরে অনেককানি পরিবর্তিত রূপে ফিরিস্তার তারিখ-ই-ফিরিস্তার। আইন-ই-আকবরী আকবেরর সময়কালে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং তারিখ-ই-ফিরিস্তা জাহাঙ্গীরের আমলে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে রচিত। পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থই অলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের ঐতিহাসিকতা বিচারে পূর্বোক্ত ইতিহাসদ্বয় প্রাসঙ্গিক। আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস তবকাত-ই-আকবরী গ্রন্থে খাজা নিজামউদ্দীন পাঠান সুলতানদের ইতিহাস প্রসঙ্গে আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন সেখানেও পদ্মিনী উপাখ্যান নেই। নিজামউদ্দীন আলাউদ্দীনের রণথম্বোর বিজয়ের বিস্তারিত বর্ণনার পর চিতোর বিজয় সম্পর্কে সংক্ষেপে বলেছেন ''এর কিছুকাল পরে সুলতান তাঁর সেনাবাহিনীসহ চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যে দুর্গটি অধিকার করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।'' আবুল ফজল আকবর নানা গ্রন্থে আকবরের চিতোর জয়ের সঙ্গে দুর্গটি অধিকার করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।'' আবুল ফসল আকবর নানা গ্রন্থে আকবরের চিতোর জারের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে যেখানে আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের প্রসঙ্গ এনেছিলেন সেখানেও পদ্মিনী প্রসঙ্গ নেই। আইন-ই-আকবরীতে ভূমিরাজস্ব প্রসঙ্গে মেবারের পরিচয় দিতে গিয়ে আলাউদ্দীনের চিতোর বিজয় কাহিনীর যে উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন সেখানে পদ্মিনীর নাম না থাকলেও জায়সীর উপাখ্যানের সঙ্গে প্রথমদিকের বেশ মিল আছে। আইন-ই- আকবরী যদি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হতে থাকে তবে এই গ্রন্থ জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্যের ৬০ বছর

পরে এবং আলাওলের অনুবাদের ৫০ বছর পূর্বে রচিত। প্রাচীন বিবরণ থেকে গৃহীত বলে চিতোর বিজয় উপাখ্যানটি আইন-ই আকবরীতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা মোটামুটি নিম্নরূপ—

দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজি মেবারের রাণা রাওল রতন-সীর পত্নীর আসাধারণ রূপের কথা শুনে তাঁকে দাবী করলেন এবং রাণা সে দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন সুলতান জোর করে অধিকার করার জন্য সসৈন্যে চিতোর অভিযান করলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল ব্যর্থ অবরোধের পর সুলতান কপট সন্ধির প্রস্তাব করলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে ভোজসভায় সুলতানকে আমন্ত্রণ জানালেন। সুলতান কয়েকজন নির্বাচিত অনুসরসহ চিতের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে যখন পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হল তখন সুযোগ বুঝে একসময় সুলতান রারাকে বন্দী করে নিয়ে চললেন। কথিত আছে সুলতানের সৈন্যদের ভিতর থেকে ৩০০ জনকে বেছে অনুচররূপে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রাণার সৈন্যদের সম্মিলিত করার আগেই সুলতান সেইসব অনুচরদের সাহয্যে জনতার বিলাপের মধ্যে দ্রুত রাজাকে বন্দী করে শিবিরে নিয়ে গেলেন। সুলতান তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য রানীকে বন্দী করে রাখলেন। তখন রাণার বিশ্বস্ত মন্ত্রীরা রাণাকে আঘাত না করার জন্য সুলতানকে অনুরোধ করলেন এবং রারী পদ্মাবতী সহ আরও অন্যান্য সুন্দরীদের হারেমে পাঠাবার প্রতিজ্ঞা করলেন। রাণীর কাছ থেকে একটি কপট পত্র সুলতানকে পাঠানো হল যাতে এ ব্যাপারে তাঁর সন্দেহমাত্র না থাকে। সুলতান আহ্বালিত হয়ে রাণার প্রতি বিদ্বেষ ভাব বর্জন করে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন। কথিত আছে ৭০০ জন নির্বাচিত রাজপুত সেনাকে রমণীর ছদ্মবেশে শিবিকার মধ্যে রেখে সুলতানের শিবিরে পাঠানো হল এবং একথা প্রচার করে দেওয়া হল যে রাণী বহুসংখ্যক সখীসহ সুলতানের শিবিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। যখন তারা শিবিরের কাছাকাছি এল তখন জানানো হল যে রাণী সুলতানের হারেমে ঢোকবার আগে রাণার সঙ্গে একবার শেষ সাক্ষাৎ করতে চান। সুনিশ্চিত প্রত্যাশা পূরণের স্বপ্নে মশগুল হয়ে সুলতান রাণীর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। রাণার সৈন্যরা সুযোগ বুঝে ছদ্মবেশে ত্যাগ করে তাদের রাজাকে মুক্ত করে নিয়ে চলল। পশ্চাদ্বাবিত সুলতানী সৈন্যদের সম্মুখীন হয়ে রাজপুতেরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল এবং রাজা বহু দূরে যাবার আগেই অনেক

মন্তব্য

সৈন্য প্রাণ দিল। অবশেষে দুই চৌহান বীর গৌরা ও বাদলও সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জন দিল। ততক্ষণে রাণা নিরাপদে চিতোরে পৌঁছে গেলেন। তখন সুলতান চিতোর জয় দুঃসাধ্য বিবেচনা করে দিল্লী ফিরে গেলেন। এর কিছুকাল পরে সুলতান পুনরায় চিতোর অভিযানে মনস্থ করলেন এবং বিফল হয়ে ফিরে চললেন। রারা সুলতানের উপর্যুপরি আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবলেন সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলে এই ধরনের বারম্বার যুদ্ধবিপর্যয় থেকে রাজ্যকে মুক্ত করা যাবে। এই ভেবে এক বিশ্বাসঘাতকের পরিচালনায় চিতোরের সাতক্রোশ দূরে একস্থানে সুলতানের সঙ্গে রাণা সাক্ষাৎ করলেন এবং নিহত হলেন। এই নৃশংস ঘটনার পর রাণার আত্মীয় অরসী সিংহাসনে বসলেন। ইতিমধ্যে সুলতান পুনরাক্রম করে চিতোর অধিকার করলেন। রাজা যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলেন এবং রমণীরা অগ্নিতে পুড়ে মরলেন।

আইন-ই আকবরীতে উল্লিখিত এই উপাখ্যানের সঙ্গে জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে উল্লিখিত চিতোর অভিযান কাহিনীর প্রথম দিকটায় অনেকখানি সাদৃশ্য থাকলেও শেষাংশের অমিল সহজেই চোখে পড়ে। বিশেষত সুলতানের দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণের বিফলতা এবং জয়ী হয়েও বারম্বার যুদ্ধের আশংকায় চিন্তিত রাণার সুলতানের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের উদ্দেশেয সাক্ষাৎকার ও মৃত্যু— ইত্যাদি ব্যাপার জায়সীতে নেই। আবুল ফজল যেপ্রাচীন উৎস থেকে এই বিবরণ উপস্থিত করছেন বলে জানিয়েছেন তা সম্ভবত পদ্মাবৎ নয়। আইন-ই-আকবরীর সমকালে রচিত দলপতি বিজয়ের রচিত রাজপুত বীর গাথা খুমান-রাসৌ গ্রন্থে পদ্মিনী াভিযানের যে কাহিনী আছে তার সঙ্গে বরং পদ্মাবতের অনেক বেশী মিল আছে। পরবর্তীকালে টড মূলত এই কাহিনীকেই অবলম্বন করেছিলেন। এই গ্রন্থে যদিও রত্নসিংহের পরিবর্তে ভীম-সীর নাম আছে, কিন্তু নায়িকার নাম যে পদ্মিনী এবং তিনি যে সিংহল রাজকন্যা এই গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। আবুল ফজল মুকুরে পদ্মাবতী রূপদর্শনের কোনো উল্লেখ করেননি, কিন্তু খুমান রাসৌ গ্রন্থে সন্ধিসর্ত রূপে আয়নায় পদ্মাবতীর রূপ দেখে আলাউদ্দীন দিল্লী ফিরে যাবেন এমন উল্লেখ আছে। বন্দী রাণার উদ্ধার ব্যাপারে ডুলি কাহিনীর মিল আছে, এবং সুলতানী সৈন্যকে মরাভূত করে গোরাবাদলকর্তৃক রাণাকে মুক্ত করার জয়োল্লাস বর্ণিত হয়েছেছ। সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে জাহাঙ্গীরের আমলে রচিত তারিখ-ই-ইপরিস্তায় পদ্মিনী উপাখ্যানে আরও পরিবর্তন ঘটেছে। মালিক মুহম্মদ জায়সীর

পদ্মাবৎকাব্যরচনার সত্তর বছর পরে ফিরিস্তা লিখছেন চিতোরের রাণাকে (নাম নেই) সুলতান বন্দী করে দিল্লী নিয়ে গেলেন। তখন রারার এক কন্যার রূপলাবণ্যের কথা শুনে রাণার মুক্তির বিনিময়ে সেই কনযাকে সুলতান দাবী করলেন। রাজপরিবারের সকলে এই সর্তের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হল এবং রারাকে গোপনে বিষ প্রয়োগে হত্যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। তখন রাজকন্যা গোপনে পিতাকে মুক্ত করার ফন্দী করে সুলতানকে কপট পত্র পাঠালেন। অতঃপর অনুচর সহ পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের অছিলায় কৌশলে রাণাকে মুক্ত করলো। পরে রাণা ফিরে এসে আলাউদ্দীনের রাজ্য লুটপাট করতে আরম্ভ করলেন। সুলতান তাঁকে দমন করতে না পেরে চিতোর দুর্গের অধিকার রত্নসেনের এক ভাগ্নেকে দান করলেন।

সুতরাং দেখা গেল যতই দিন গেছে চিতোর অভিযান নিয়ে নানা কল্পিত উপাখ্যান এসে ভীড় করছে। এক্ষেত্রে ইতিহাসের সত্য শুধু এই, ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন একবার মাত্র অভিযান করে সাত মাসের মধ্যে চিতোরের রাণা রত্নসিংহকে পরাজিত অথবা নিধন করেন এবং পুত্রের নানানুসারে অধিকৃত চিতোরের নাম রাখেন খিজিরাবাদ।

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যটি যেহেতু জায়সীর পদ্মাবৎ-রে অনুবাদ সেইজন্য জায়সীর কাব্যের অনৈতিহাসিকতার দায়ভার অনুবাদ কাব্যেও বর্তেছে। ইতিহাসে নায়কের নাম রত্নসেন (দ্র. একলিঙ্গমাহাত্মন্ গ্রন্থের রাজবর্ণন অধ্যায়) রত্নসিংহ বা রতন সিংহ (১৩৫৯ সম্বতের মাঘ মাসের একটি শিলালিপি) যাইহোক না কেন তাঁর পিতার নাম চিত্রসেন নয়, সমর সিংহ; ইতিহাসের রত্নসেন সমর সিংহের মৃত্যুর পর ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট পর্যন্ত চিতোরের রাণা ছিলেন। এই সার্দ্ধবৎসরের মধ্যে শেষ ছয় মাস কেটেছে সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধকার্যে এবং চিতোর রক্ষার ব্যাপারে। সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট এক বছরে চিতোর থেকে সিংহলে গিয়ে পদ্মাবতীকে বিবাহ করে সেখানে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে চিতোরে প্রত্যাবর্তন কালগত দিক থেকে সম্পূর্ণ অসম্ভব। জায়সীর অনুসরণে খুমান রাসৌ গ্রন্থে সিংহল রাজকন্যা রূপে পদ্মিনীর একটা ঐতিহাসিক পরিচয় দেবার চেষ্টা আছে কিন্তু আলাউদ্দীনের সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য অনুযায়ী পদ্মিনী বা পদ্মাবতী উপাখ্যান সম্পূর্ণই কাল্পনিক, এর কোনো বাস্তব ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আলওলের কাব্যেও

মন্তব্য

শুক নির্দেশে যোগীবেশে রত্নসেনের সিংহল গমন এবং পদ্মাবতীকে বিবাহ করে সমুদ্রবিপর্যয় অন্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ঘটনা মূলত রূপকথার রোমান্স, ইতিহাস কাহিনী নয়। কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায় যেখান থেকে চিতোর অভিযানের ইতিহাস শুরু হয়েছে সেখানেও নয়ক রত্নসেন এবং প্রতিনায়ক সুলতান আলাউদ্দীন ছাড়া সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। রাঘব চেতন এবং তর কার্যকলাপ অনৈতিহাসিক। জায়সীর সরজা এবং আলাওলের শ্রীজাও কাল্পনিক। সুলতন আলাউদ্দীনের চিতোয় অবরোধ ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু চিতোর জয়ে ব্যর্থ হয়ে সন্ধি সংকল্প এবং তৎপরবর্তী যাবতীয় ঘটনাবলী ইতিহাসের তথ্য নয়, কবিকল্পনার সত্য। ইতিহাসে চিতোর জয়ের জন্য আলাউদ্দীনকে একাধিকবার অভিযান করতে হয়নি, সুলতানের চিতোর অভিযানের সঙ্গী আমীর খসরুর বিবরণ অনুযায়ী প্রথমবারের অভিযানেই সাতমাসের মধ্যে চিতোর সুলতানের অধিকারে আসে। এক্ষেত্রে জায়সী ও আলাওলের বিবরণ অনৈতিহাসিক। সুলতানের কারাগার থেকে বন্দী রত্নসেনকে উদ্ধার করার ব্যাপারে ডুলি কাহিনীর যত চমৎকারিত্বই থাক তা আলাউদ্দীনের সময়ে ঘটেনি; ঘটেছিল শেরশাহের জীবনে। রত্নসেনের সেনাপতিদ্বয় গোরা ও বাদিলা চরিত্র দুটিও আলাউদ্দীনের সময়কার ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আসেনি। উদয়পুরের একলিঙ্গজী মন্দিরের শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে যে ১৪৪৫ সংবৎ বা ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে গোরা উপাধিযুক্ত বাদল নামক এক রাজপুত সর্দার মান্ডুর সুলতান গিয়াসুদ্দীন খলজীকে পরাস্ত করে বহু মুসলমানকে যেখানে হত্যা করেন সেই স্থল বাদল শৃঙ্গ নামে বিখ্যাত। জায়সীতে বাদলের বিজয় বৃত্তান্ত নেই, কিন্তু আলাওলে বাদলের যুদ্ধবিজয় বেং টঙ্গী নির্মাণের কাহিনী আছে।কুম্ভলগড়ের রাজা দেবপালের সঙ্গে যুদ্ধে রত্নসেনের আহত হয়ে মৃত্যুবৃত্তান্তও কাল্পনিক, রত্নসেন সুলতানের হাতেই মৃত্যু বরণ করেন বলে ইতিহাসে বর্ণিত। মন্‌নৌৎ নৈনসীর (১৬১১-১৬৭১ খ্রী) খ্যাত বা ইতিবৃত্তে পদ্মিনী সংক্রান্ত বিবরণে আলাউদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে রতন সীর মৃত্যুর উল্লেখ আছে। চিতোর পতন সম্পর্কে জায়সীর কাব্যের এই বিবরণটুকু মাত্র ঐতিহাসিক—

জৌহর ভঁই সব ইস্তিরী পুরুভষ ওএ সংগ্রাম।

বাদসাহ গঢ়চূরা চিতউর ভা ইসলাম।। (পদ্মাবতী, প্রথমখণ্ড পৃঃ ৩৪৫)

নারীরা জহরব্রত করল। পুরুষেরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। বাদসাহ দুর্গ চূর্ণ করলেন, চিতোর ইসলাম (রাজ্য) হল।

কিন্তু চিতোর পতনের এই ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তটুকুও আলাওলের কাব্যে অনুপস্থিত। 'পদ্মাবৎ' কাব্যের ঐতিহাসিক যুদ্ধসমাপ্তিকে অগ্রাহ্য করে আলাওলের কাব্যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক এক আদর্শবাদী মিলন বৃত্তান্ত বর্রিত।

আলাওল জায়সীর কাব্য অনুবাদ করতে বসে ইতিহস অংশে যেসব ঘটনাগত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তার সঙ্গে পঞ্চাশ বছর আগের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার কয়েকটি আকস্মিক সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

এক, রত্নসেনকে মুক্ত করার জন্য সুলতানের কাছে পদ্মাবতীর নামে কপটপত্র প্রেরণ এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রত্নসেনের সঙ্গে উল্লসিত সুলতানের সু-ব্যবহার। এই ধরনের কোনো বিবরণ জায়সীতে নেই, অথচ আইন-ই-আকবরীতে আছে এবং আলাওলের পদ্মাবতী কপট দৌত্য খণ্ডেও এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

দুই, সৈন্যসহ সুলতানের দ্বিতীয়বার চিতোর অভিযান এবং বিফল মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন। এ ঘটনার শেষাংশ জায়সীতে বিপরীত। কিন্তু আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত এই অভিনব ঘটনার আভাস পাওয়া যাবে আলাওলের গোরা নিধন খণ্ডের শেষে বাদলের জয় বৃত্তান্তে, যার সুনিশ্চিত বৃত্তান্ত আছে পরিশিষ্টের অন্তর্গত সুলতান আলাউদ্দীনের পরাজয় ও পলায়ন বৃত্তান্তে।

তিন, জায়সীর কাব্য শেষ হয়েছে চিতোর পতনে, মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যে। কিন্তু আলাওলের অনুবাদকাব্য সমাপ্ত হয়েছে মুমূর্ষু রত্নসেনের অভিপ্রায় অনুযায়ী সুলতানের সঙ্গে রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের মৈত্রী ও প্রীতি সম্পর্কের মধ্যে। 'আইন-ই-আকবরী'তে বর্ণিত উপাখ্যানের শেষ দিকে লক্ষ্য করা যায় বারম্বার যুদ্ধে ও উপর্যুপরি আক্রমণে ক্লান্ত রত্নসেন ভাবছেন সুলতানের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করলে দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। সেই উদ্দেশ্যে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে রত্নসেনের মৃত্যু। আলাওল রত্নসেনের মৃত্যুর উপলক্ষ হিসাবে জায়সীর অনুসরণে দেবপাল বৃত্তান্তের উল্লেখ করলেও মুমূর্ষু রত্নসেনের মুখে সুলতানের সঙ্গে পুত্রদের মৈত্রী নির্দেশ দেবার ব্যাপারে কী সূক্ষ্মভাবে 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লিখিত রত্নসেনের

মন্তব্য

ভাবনাকে অনুসরণ করেছিলেন? পঞ্চাশ বছর আগে লেখা আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর সঙ্গে আলাওল পরিচিত ছিলেন কিনা জানা নেই, জায়সীর কাব্যের শেষাংশের এই পরিবর্তনও আলাওলের কি না জানা যায় না, তবে হিন্দুমুসলমান মৈত্রীর পটভূমিকায় আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের শেষে রত্নসেনের মৈত্রী ভাবনার সঙ্গে আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত রত্নসেনের সন্ধিভাবনার সাদৃশ্য আছে।

১৪.৩। পদ্মাবতী কাব্যের ভাষা ও ছন্দ সমাজ সংস্কৃতি

'পদ্মাবতী' মূলত অনুবাদ কাব্য হলেও আলাওলের আত্মপরিচয়, রোসাঙ্গ বর্ণনা এবং মাগন প্রশস্তি প্রভৃতি অধ্যায়গুলিতে তৎকালীন আরাকান রাজ্যের এবং সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সেই সময়ে আরাকান রাজ্যে বাণিজ্য ব্যপদেশে বহুদেশ থেকে বহু জাতির সমাগম হত। রাজসভায় সমাগত যে জনমণ্ডলীর পরিচয় আলাওল দিয়েছেন তাতে আরব, মিশরী, তুর্কি, হাবশী, রুমী, খোরসানী, উজবেগী, লাহোরী, মূলতানী, সিন্ধি, কাশ্মীরী, দক্ষিণী, কামরূপী, বাঙ্গালী, মোগল, পাঠান, রাজপুত, ধর্মী, শযামদেশী, ত্রিপুরী, কুকী ইত্যাদি বহু বিচিত্র দেশী, বিদেশীর উল্লেখ আছে। ইউরোপীয়দের মধ্যে আর্মানী, ওলন্দাজ, দিনেমার ইংরেজ, কান্টিলান, ফ্রান্সিস বা ফরাসী, পর্তুগীজ ইত্যাদির উল্লেখ আলাওলের বাসভূমি রোসাঙ্গ নগরী যে সযুগে বহুজাতিক নগর বা 'কসোমোলিটন সিটিতে' পরিণত হয়েছিল সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। আরাকান সেই সময় নৌবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। 'পদ্মাবতী' কাব্যের রোসাঙ্গ বর্ণন অধ্যায়ে বহুপ্রকার নৌকার বর্ণনা আছে। আত্মবিরণ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে হার্মাদ বা পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার ছিল প্রবল। কবি স্বয়ং এই অত্যাচারের কবলে পড়েছিলেন। আরাকান রাজসভায় বিশেষত অমাত্যসভায় বহু ভাষা ও কাব্যশাস্ত্রের চর্চা হত। বাংলা, আরবী, ফারসী, মগী, হিন্দি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পৃষ্ঠ পোষক মাগন ঠাকুর কাব্যশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদিতে পারঙ্গম ছিলেন। এ ছাড়া নৃত্য গীত বাদ্য রাজসভার সংস্কৃতির অঙ্গ রূপে পরিগণিত হত। অশ্বক্রীড়া, পোলোখেলা, শিকার ইত্যাদি রাজা ও অভিজাতদের আমোদ প্রমোদের বিষয় ছিল। এছাড়া ছিল হস্তবিহার। রোসাঙ্গ বর্ণনা থেকে জানা যায় আরাকান রাজারা শ্বেতহস্তরীর অধিকারী ছিলেন।

মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্য রচনার (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে) শতবর্ষ পরে

কাব্যটি আলাওল কর্ত্তৃক অনূদিত হয়। এই একশো বছরে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। সমাজের শীর্ষে আছেন রাজা, তাঁকে কেন্দ্র করে বিরাজ করছে অভিজাত অমাত্যমণ্ডলী বেং তারপর রয়েছে স্তরে স্তরে সমাজের নানা অবস্থার মানুষ। আলাওল নিজেও ছিলেন এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত অমাত্যপ্রসাদপুষ্ট একজন সামাজিক মানুষ। আলাওল নিজেও ছিলেন এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত আমাত্যপ্রসাদ পুষ্ট একজন সামাজিক মানুষ। অমাত্যসভায় যে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তিনি এ অনুবাদকাব্য পরিবেশন করেছিলেন র্তারাও ছিলেন সামন্ত সমাজসংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত। এই ভূমিভিত্তিক সামন্তপ্রভুরা চিলেন সমাজের সুবিদাভোগী শ্রেণী! এঁরা যুদ্ধ বিদ্যায় যেন পারদর্শী ছিলেন তেমনি কাব্যচর্চায়ও সমান উৎসুক ছিলেন। প্রচুর ভোগ ও অবসরপুষ্ট এই অমাত্য ও সামন্তশ্রেণী প্রেম ও যুদ্ধের রোমান্সরস মুখ্য কাব্যকাহিনী বিশেষ পছন্দ করতেন। এঁদের কাছে দার্শনিক তত্ত্বভাবনার চেয়ে প্রেম ও যুদ্ধকাহিনীর উত্তেজনা বেশী আকাঙ্ক্ষিত ছিল। জায়সী তত্ত্বাশ্রয়ী করে যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজজীবনকে পদ্মাবৎ কাব্যে উপস্থিত করেছেন আলাওল সেই তত্ত্বকথাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও স্থানে স্থানে বর্জন করে প্রেম ও যুদ্ধের রোমান্স কথাকেই সভার শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। জায়সীর অনুসরণে আলাওলের পদ্মাবতীর কাব্যের মধ্যেও দুর্গভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চিত্রই ফুটে উঠেছে। সিংহল, চিতোর ও দিল্লী নগরকে কেন্দ্র করে রাজপ্রাসাদ, দরবার, দুর্গপ্রাকার, পরিখা,তোরণ, বুরুজ, উদ্যান প্রাঙ্গন, হাট বাজার, রাস্তাঘাট এবং মানুষজের যে পরিচয় আছে তা অনেকটাই মুলানুসারী (দ্রষ্টব্য, প্রথমখণ্ড)। মুলানুসারিতার ফলে পদ্মাবতী কাব্যের সমাজও অভিজাত সমাজ, দরিদ্রের কথা এখানে নেই।

সমাজ সংস্কৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে অনুবাদের যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে তা মূলত কালগত নয় দেশগত। জায়সীর কাব্যে বর্রিত সমাজ মূলত উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের ভৌগোলিক সীমানাবেষ্টিত। অপরদিকেআলাওলের অনুবাদ হয়েছে প্রত্যন্তবঙ্গ আরাকানে বসে। আলাওলের সমাজ ও জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা মূলত বঙ্গীয়। এর ফলে অশনে বসনে, ভূষণে ব্যসনে এবং আচার আচরণের বর্ণনা যেখানেই মূলের সঙ্গে অনুবাদের পার্থক্য দেখা দিয়েছে সেখানেই কবির বাঙ্গালিত্ব প্রতিফলিত

মন্তব্য

হয়েছে। এ বযাপারে সবচেয়ে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে পদ্মাবতীর বিবাহ বর্ণনার পরিচ্ছেদটি। মূলের বিবাহ বর্ণনা অনেক সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ। সেখানে মালাবদল, সপ্তপদী গমন, বেদপাঠ ইত্যাদি হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের কিছু কিছু চিত্র থাকলেও তা বিস্তারিত নয়। এ বযাপারে জায়সীর অভিজ্ঞতাও খুব ব্যাপক বলে মনে হয় না। কিন্তু পদ্মাবতীর বিবাহবর্ণনায় আলাওল বঙ্গীয় বিবাহরীতি ও স্ত্রী-আচার সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিক বিস্ময়কর। গাত্রহরিদ্রা, যোড়শমাত্রিকা পূজা, বসুধারা, নান্দীমুখ, শ্রাদ্ধ, বরবরণ, কন্যা আনয়ন, শুভদৃষ্টি, সম্প্রদান ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক বর্ণনায় এবং বিবাহোৎসবে বিধবাবর্জন ইত্যাদি ব্যাপারে আলাওল বঙ্গীয় সমাজঅভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। রত্নসেনের বিবাহবর্ণনায় একদিকে নৃত্য গীত বাদ্যের বিবরণ অপরদিকে বিচিত্র আতসবাজি পোড়ানোর বর্ণনা অনেকখানি মধ্যযুগীয় সামন্তনৃপতি বিবাহবর্ণনার অনুরূপ— বিশেষত বিবাহ শোভাযাত্রায় বেশ্যা নটীদের নৃত্যবর্ণনা পূর্বোক্ত সংস্কৃতিচিহ্নিত। তবে জায়সী বিবাহ বর্ণনায় সঙ্গীতে পরিবর্তে ভোজনের উপর জোর দিয়েছেন আর আলাওল এক্ষেত্রে সঙ্গীতকেই মুখ্য করে তুলেছেন— এ পার্থক্য উভয় কবির রুচির পার্থক্য, সমাজের পার্থক্য নয়। সঙ্গীতের ও নৃত্যের বর্ণনা জায়সী যেখনে যেখানে করেছেন সেখানে তিনি মনোরা ঝুমুক, চাচরী ইত্যাদি উত্তর ভারতের প্রচলিত লোক সঙ্গীত ও লোক নৃত্যের উপর বেশী জোর দিয়েছেন, অপরদিকে আলাওল সঙ্গীতশাস্ত্র অনুযায়ী ধ্রুপদী নৃত্যগীতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় কীর্তনের উল্লেখ করেছেন। রাজা বাদশাহ যুদ্ধখণ্ডের সঙ্গীত বর্ণনায় ধ্রুপদের পরেই বিষ্ণুপদের উল্লেখ আছে।

পদ্মাবতী কাব্য যদিও জায়সীর 'পদ্মাবৎ'-এর অনুবাদ তবুও আলাওলের নিজস্ব সংযোজিত অংশে সমকালীন সমাজজীবনের ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। সিংহলের হিন্দু রাজপ্রাসাদের বর্ণনায়, হাটের বিবরণে নারীদের পোষাকপরিচ্ছদ ও অলঙ্কার বর্ণনায়, জলাশয়-পশুপক্ষী বেং বৃক্ষ ও ফলফুল ইত্যাদির বিবরণে আলাওল স্বদেশ ও স্বকালের কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছেন। 'চতুর্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্ধুগণ'সহ গন্ধর্বসেনের সিংহল রাজসভা আলাওলের বর্ণনায় জায়সীর তুলনায় অনেক বঙ্গীয়। এ যেন মাগন ঠাকুরের ামাত্য সভার বর্ণনা। মূলের রাজকীয় জাঁকজমক এখানে অনুপস্থিত।সিংহলের হাটবর্ণনায় আলাওল যে সকল দ্রব্যের তালিকা দিয়েছেন

তাতে মুলাতিরিক্ত কিছু কিছু বঙ্গীয় পণ্যসম্ভারও আছে; যথা 'জরতারি পাটাম্বর সুচারু চামর' ইত্যাদি। শাস্ত্রখণ্ড ও চৌগানখণ্ড দুটি আলাওলের অতিরিক্ত সংযোজন। এই খণ্ড দুটিতে রত্নসেনের পান্ডিত্য প্রকাশ উপলক্ষে সেকালের শাস্ত্রচর্চার বেশ কিছু নিদর্শন আছে। রত্নসেনের বহুমুখী পাণ্ডিত্য কিছুটা আদর্শায়িত হলেও সেকালের সমাজে প্রচলিত বিদ্যাচর্চারূপে শাস্ত্রতালিকাটি উল্লেখযোগ্য— সূত্রবৃত্তি, পঞ্জিকা, ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, পুরাণ, বেদ, তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কার, ছন্দশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, আগম ইত্যাদি সেযুগের অভিজাত সমাজে চর্চা করা হত। চৌগান বা পোলো খেলা সামন্ত যুগে বেশ উত্তেজনাকর ক্রীড়াকৌতুক হিসাবে জনপ্রিয় ছিল বলেই আলাওল রত্নসেন পরীক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে এই বিসয় অবলম্বনে মূলবহির্ভূত একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। পদ্মাবতীর সাজসজ্জাবর্ণনায় আলাওল যে বসনের তালিকা দিয়েছেন তা মূল থেকে স্বতন্ত্র। পদ্মাবতী রত্নসেন -ভেঁট খণ্ডে শেষে জায়সী পদ্মাবতীর জন্য চাঁদনৌতা, বাঁশপুর, ঝিলমিল, খরদুক, পেমচা ডরিয়া, চৌধুরী ইত্যাদি কয়েক পররকার বসন আমদানি করেছেন। আলাওল পদ্মাবতী কাব্যে উক্ত খণ্ডের শেষে বসনের তালিকা না দিলেও পদ্মাবতী-রূপবর্ণন খণ্ডে শুকমুখে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে সর্বশেষে যে অতিরিক্ত স্তবকটি যোগ করেছেন তার মধ্যে পদ্মাবতীর কাপড়ের একটি তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকায় নানা নামের নানাপ্রকার বসন উল্লিখিত হয়েছে, যথা জরতারি, রমাপতি, গঙ্গাজল, কিরিমিজি, মলমল, ঝিলমিলি ইত্যাদি— এগুলি তৎকালে প্রচলিত বসন হিসোব অভিজাত সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। ভূষণের বর্ণনায় আলাওল অনেকক্ষেত্রেই মূলানুসারী তবে নিম্নলিখিত কনের সাজটি আদর্শায়িত বর্ণনা হলেও আলাওলের নিজস্ব রচনা— কিঙ্কিনী ঘুঁঘর বাজয় ঝাঁঝর ঝনঝন নেপুর মধুর গীতা' (পৃ: ১৮০)। এছাড়া নারীর অলঙ্কাররূপে বেসর, রসনা, রত্নকুণ্ডল, সাতছরি হার, অঙ্গদ, কঙ্কণ, রত্নবলয়, রত্নাঙ্গুরী, কটীভূষণ, নূপুর ইত্যাদি মূল ও অনুবাদ উভয়ক্ষেত্রেই বর্ণিত।

পদ্মাবতী কাব্যের মূল এবং অনুবাদ দুইই মুসলমান কবির রচনা। কিন্তু মুসলমান সমাজের বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য পরিচয় এখানে নেই। কাব্যে হিন্দু জীবনচরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কবির বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে, কিন্তু আরবী ফারসী শব্দে মতোই এ কাব্যে মুসলিম সমাজের তথ্য ও উপকরণের যথেষ্ট অভাব। রাজপুত

মন্তব্য

কাহিনীতে তো বটেই এমনকি সুলতানী অভিযান বৃত্তান্তেও এর অভাব বিস্ময়কর। কোনো কোনো সমালোচক আলাউদ্দীনের উক্তির মধ্যে আলাওলের হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। সুলতানের আক্রমণ থেকে রত্নসেনকে রক্ষা করার জন্য হিন্দু রাজ্যগণ আলাউদ্দীনের দরবার থেকে বিদায় প্রার্থনা করলে সুলতানের উক্তি-

মোছলমান জাতির মনেত করি আশা।
কদাচিত না করিব হিন্দুর ভরসা।।
দীন মহম্মদ আছে মোর শিরে ছত্র।
তাহার প্রসাদে হৈব বিজয় সর্বত্র।। (বাদশাহ আক্রমণ খণ্ড, পৃঃ ২৮৪)

একে হিন্দুবিরোধী মুসলমান সমাজের সাম্প্রদায়িক মনোভাব বলে না ধরে সুলতানের তৎসমসাময়িক উক্তি বলে মনে করাই সঙ্গত। বাস্তবিক আলাওল ে ব্যাপারে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন সেটা জায়সীর সুলতান-সেনাপতি সরজাকে বিপ্র 'শ্রীজা'য় পরিবর্তিত করার দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। পদ্মাবৎ কাব্যে আলাউদ্দীনের দূত রূপে রত্নসেনের সভায় যাকে পাঠানো হয়েছিল সে 'সরজা' নামক এক মুসলমান যোদ্ধ। কিন্তু আলাওল রত্নসেনের সভায় প্রেরিত সুলতানের দূতের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন-

শ্রীজা নামে এক বিপ্র পরম চতুর।
অতি বড় কথক সংগ্রামে মহা শূর।। (পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ড ২৭৬)

পদ্মাবতীর খিল খণ্ডের পরিকল্পনা হিন্দু মুসলমান মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মদ্মাবৎ কাব্যে শেষপর্যন্ত হিন্দু রাজপুত-বীরের পরাজয় এবং মুসলমান রাজশক্তির জয় দেখানো হয়েছে। পদ্মাবতীকে অধিকার করতে না পারলেও মূলে চিতোর সুলতান কর্ত্তৃক অধিকৃত হল। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে চিতোর জয়ের পরিবর্তে সুলতানের সঙ্গে রাজপুত্রদ্বয়ের সন্ধি ও মৈত্রী সম্ভবত হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে সম্ভাব ও সৌহার্দ ভাবনা থেকেই উদ্ভূত। বস্তুত সুফীধর্মের প্রভাবেই হোক অথবা দীর্ঘকাল পাশাপাশি এক সঙ্গে থাকার জন্যেই হোক হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে যে ধীরে ধীরে পারস্পরিক ঔৎসুক্য ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল আলাওলের কাব্য পাঠ করলে তা বেশ উপলব্ধি করা যায়। যিনি ইসলামী স্মৃতিশাস্ত্র তোহফার নিষ্ঠাবান অনুবাদক তিনিই আবার পদ্মাবতীর অনুবাদে

হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। রত্নসেনের মৃত্যুর পর পুত্রদের শ্মশানকর্ম সম্পর্কে যে অংশটি পদ্মাবতীতে আছে সেটি মূলবহির্ভূত, সুতরাং হরিনাম উচ্চারণ সহ যেসব হিন্দু ক্রিয়াকর্মের উল্লেখ আছে তা নতুন সংযোজন। সন্তানের জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে বিবাহ এবং শ্মশানকর্ম' পর্যন্ত সবকিছুতে আলাওল হিন্দু ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে বিস্ময়কর াভিজ্ঞতা রেখে গেছেন। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজমূলতঃ ধর্মান্তরিত মুসলমান সম্প্রদায়, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের পূর্বপুরুষই আগে কোনো না কোনো সময় হিন্দুই ছিলেন। সুতরাং পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত হলেও বংশানুক্রমিক হিন্দু পুরণ ও লোকাচার সংস্কার দূর হবার নয়। আলাওলের কাব্যেও হিন্দু পুরাণ ও লোকসংস্কারের অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। জায়সী সুফীধর্মের উদারতা বশত বেহেস্ত-এর বদলে কৈলাস লিখেছেন আর আলাওল অবিচ্ছিন্ন বঙ্গীয় সংস্কৃতির মধ্যে থেকে কোরাণ ও পুরাণকে এক করে নিয়েছেন।

মন্তব্য

১৪.৪। অনুবাদক হিসেবে মালিক মুহম্মদ জায়গীর

'A translator is a traitor'— অনুবাদকর্ম সম্পর্কে এটা যেমন একপক্ষের ধারণা তেমনি রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন— 'মূলের ভাবটাকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মানানসই করে আঁট করা চলে না।'— তখন এই পরস্পর বিরোধী ভাবনা দেখে স্পষ্টতই মনে হয় যে অনুবাদের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ নেই। অনুবাদ সাহিত্যের আদর্শ অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক— মূলের কাচাকাছি হলে তা আক্ষরিক অনুবাদ, দূরবর্তী হলে ভাবানুবাদ।

মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ কাব্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজ্য ও অমাতাবর্গ। রাজসভায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধ্রুপদী সাহিত্যের চর্চা হত। মূল রামায়ণ মহাভারত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তার অনুবাদ কর্মেও রাজারা উৎসাহ দিতেন। কবিত্বশক্তির জন্যে কৃত্তিবাসকে গৌড়েশ্বর উপহার দিতে চেয়েছিলেন, মালাধর বসু গুণরাজ খাঁ উপাধি পেয়েছিলেন, পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতঅনুবাদ করেছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ছুটি খাঁর উৎসাহে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ছুটি খাঁর উৎসাহে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন শ্রীকর নন্দী। পরবর্তীকালে কুচবিহার রাজসভায় রামায়ণ মহাভারতের প্রচুর অনুবাদ হয়েছিল, বিষ্ণুপুর রাজসভায় রামায়র মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন শঙ্কর কবিচন্দ্র। বর্ধমান

মন্তব্য

রাজসভায় রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ করে রাজাদের অর্থানুকূল্যে ছাপিয়ে বিতরর করা হয়েছিল। অবশ্য রাজানুকূল্য ছাড়াও কবিদের ব্যক্তিগত আগ্রহে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত অনুবাদক হয়নি। তবে অধিকাংশ রাজসভায় ক্লাসিক চর্চা অনুবাদ কর্মেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মধ্যযুগের রাজন্যপোষিত অনুবাদকর্মের ইতিহাসে আরাকান রাজসভায় মুসলমান কবিদেরও একটা উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। এ ব্যাপারে আরাকান রাসভার অনুবাদ কর্মের কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়—

১। কবি এবং কবির পৃষ্ঠপোষক যেহেতু ধর্মমতে মুসলমান সেইজন্যে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি হিন্দু পুরাণ অনুবাদের পরিবর্তে সুফীধর্ম সংশ্লিষ্ট প্রেমকাহিনীর প্রতি মনোযোগ।

২। আরাকান বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় গৌড়ীন সংস্কৃতি থেকে অনেকটা দূরবর্তী— এর ফলে প্রচলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত আরাকান রাজসভায় লৌকিক প্রণয় কাহিনীচর্চার একটা স্বতন্ত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত আরবী ফারসী কাব্য ও কেচ্ছাকাহিনীর সঙ্গে ঐতিহ্যগত যোগাযোগ এখানকার অনুবাদ কর্মের বিষয়বস্তুতে নূতনত্ব এনেছিল।

৩। বাণিজ্যসূত্রে বহুজাতির সমাবেশে আরাকান বা রোসাঙ্গ নগর সেই সময় একটা কসমোপলিটন নগরীতে পরিণত হয়েছিল। বহুভাষার চর্চা ও বহুমুখী সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের অভীপ্সা থেকেই জাগে অন্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছা। উত্তর প্রদেশের সঙ্গে আরাকানের আগের থেকেই রাজনৈতিক কারণেই যোগাযাগ ছিল। আরবী, ফারসী, মগ এবং বাংলাভাষার পাশাপাশি হিন্দী ভাষারও চর্চা আরাকানে হত। হিন্দী ভাষা চর্চার সঙ্গে হিন্দী প্রণয় কাহিনীর প্রতি দেখা দিয়েছিল অমাতাদের আগ্রহ। তার ফলে আরাকানরাজ শ্রীসুধর্মার আমত্য আসরফ খাঁর নির্দেশে হিন্দী কবি সাধনের মৈনাসৎ অবলম্বনে দৌলতকাজি আরম্ভ করলেন সতী ময়নার অনুবাদ আর থদো মিন্‌তারের রাজত্বকালে আমাত্য মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল অনুবাদ করলেন কেশো বছর আগে লেখা মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্‌মাবৎ-এর।

৪। পদ্‌মাবৎ কাব্য অনুবাদের উপলক্ষ্য সম্পর্কে আলাওল ও কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে কিছু তথ্য জানিয়েছেন। একদিন গুণীজন পরিবৃত মাগন ঠাকুরের অমাত্যসভায়

নানাবিধ কলাচর্চার আসরে পদ্মাবৎ কাব্যের কাহিনী শুনে পরম কৌতুকে মাগন আলাওলকে এই কাব্য অনবাদের নির্দেশ দিলেন। হিন্দী কাব্য যেহেতু রোসাঙ্গের সকলে বোঝে না, তাই সকলের রসতৃপ্তির জন্যে বাংলা পয়ারে অনুবাদের জন্য মাগন ঠাকুর আলাওলকে অনুরোধ করলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাগন দৌলত-কাজির লোরচন্দ্রাণীর উল্লেখ করেছিলেন। লস্কর উজীর আসরফ খাঁর নির্দেশে দৌলত কাজী যেমন সতী ময়না বা লোরচন্দ্রাণী অনুবাদ করেছিলেন। আলাওলও তেমনি মাগনের নির্দেশে জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ করুন এটাইছিল পৃষ্ঠপোষকো অভিপ্রায়। আলাওলও মাগনের আদেশ শিরোধার্য করে অনুবাদ কর্মে ব্রতী হলেন।

অনুবাদকর্ম সম্পর্কে আলাওলের কোন্ জাতীয় আদর্শ ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল সে সম্পর্কে কবি সুনিশ্চিত কোনো অভিমন না দিলেও একটি চরণে তার চকিত আভাস দিয়েছেন। কাব্যকাহিনি আরম্ভ করার ঠিক আগেই আলাওল জায়সীকে স্মরণ করে লিখেছেন—

এহি সূত্রে কবি মহম্মদে করি ভক্তি
স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি।।

এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় আলাওল কোন্ জাতীয় অনুবাদের আদর্শে বিশ্বাসী। মূলের 'অনুরূপ' নয় 'প্রতিরূপ' রচনাই আলাওলের উদ্দেশ্য। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের শেরশাহের রাজত্বকালে উত্তর ভারতের হিন্দী কবি জায়সী সুফী ভাবনাকে অবলম্বন করে কিছুটা রূপকথার যাদু এবং কিছুটা ইতিহাসের মায়া দিয়ে যে অসামান্য প্রেমের কাব্য রচনা করেছিলেন একশো বছর পরে সুদূর আরাকানে অমাত্য সভায় বসে তাকে ঠিক হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ করলে মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা হয়তো থাকে কিন্তু স্বকালের ও স্বদেশের শ্রোতার প্রতি অবিচার করা হয়। এ ছাড়া যে পরবেশে আলাওল অনুবাদ করেছিলেন সেই পরিবেশও স্বতন্ত্র। সুফী সাধক জায়সী কাব্য রচনা করেছিলেন যে সব সহমর্মী শ্রোতাদের জন্য তারা এবং আলাওলের অমাত্য সভার শ্রোতা ঠিক একশ্রেণীর নয়। জায়সী তাঁর কাব্যের প্রথমে যে বন্ধুবর্গের পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে যুসুফ মালিক ছিলেন জ্ঞানী ও পণ্ডিত যিনি শব্দের গূঢ় অর্থের প্রথম মর্মজ্ঞ বলে কবি জানিয়েছেন। আলাওল ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরও পণ্ডিত সন্দেহ নেই, কিন্তু যাদের জন্য আলাওলকে মাগন এই অনুবাদকর্মের নির্দেশ দিয়েছে তারা গল্প

মন্তব্য

কাহিনীর রোমান্স-রসে যতখানি আগ্রহী, শব্দের গূঢ় অর্থ এবং তত্ত্বের মার্মিকতায় ততখানি কৌতূহলী বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আলাওলও জায়সী নন। জায়সী ছিলেন মূলত সাধক ও মরমী, আলাওল সামাজিক ও সাংসারিক, কবি হিসাবে জায়সী ছিলেন ভাববাদী, আলাওল ছিলেন বস্তুবাদী, জায়সী ছিলেন আগে কবি পরে পণ্ডিত, আলাওল ছিলেন আগে পণ্ডিত পরে কবি।

জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্যের থীম রূপকধর্মী নয়, নীতিধর্মী, অ্যালিগোরিক্যাল নয় এথিক্যাল, এবং তা সুফী প্রেম-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত।এ কাব্যে স্পষ্ট দুটি উপাখ্যান আছে— দুটোই ত্রিভুজ প্রেমের উপাখ্যান। একটি রত্নসেন-নাগমতি-পদ্মাবতীর প্রণয়কাহিনী, অপরটি আলাউদ্দীন-রত্নসেন -পদ্মাবতীর প্রেমকাহিনী। একটিতে আছে প্রেমের সার্থকতা, অপরটিতে ব্যর্থতা। দুটো কাহিনী সংশ্লিষ্ট কিন্তু বিপ্রতীপ, শুকের মাধ্যমে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে রত্নসেন প্রণয় বিহ্বল হয়েছিলেন,— এক অপার্থিব বিরহবোধ তাঁকে যোগী করেছে। রাজ্য ত্যাগ করে আত্মক্ষয়ী যোগসাধনার দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে অনেক কৃচ্ছ্রসাধনার পর তিনি প্রেমসিদ্ধি অর্জন করে পদ্মাবতীকে লাভ করলেন। দ্বিতীয় কাহিনীবৃত্তে সুলতান আলাউদ্দীনও রাঘবচেতনের মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পদ্মাবতীর জন্য কোনোরূপ সাধনা করেননি, তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। পদ্মাবতীকে জোর করে সৈন্যবলে ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। না পেরে প্রতারণরার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। রত্নসেনকে বন্দী করে দূতী পাঠিয়ে পদ্মাবতীকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। দুটো কাহিনীকে পাশাপাশি রেখে জায়সী সম্ববত এটাই বলতে চেয়েছেন, প্রেমকে পেতে গেলে সাধন করতে হয়, বলে বা ছলের দ্বারা তা পাওয়া যায় না। শুকগুরুর পথনির্দেশে রত্নসেন যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, রাঘব চেতনের প্ররোচনায় আলাউদ্দীন প্রেমলুব্ধ হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সাধনার শক্তি ছিল না। ক্ষমতা পার্থিব,— তার দ্বারা রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু অপার্থিব প্রেমকে অর্জন করা যায় না। সুলতান শেষপর্যন্ত চিতোর অধিকার করলেন বটে, কিন্তু পদ্মাবতী তাঁর অনায়ত্তই রয়ে গেল। এই তাৎপর্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করলেই জায়সীর পদ্মাবৎ কাবেযর যথার্থ মর্মস্থলটিকে স্পর্শ করা যাবে। আলাওলের অনুবাদে জায়সীর কাব্যকে এইভাবেই উপস্থিত করা হয়েছে, কিন্তু আলাওলের জীবনদৃষ্টি যেহেতু আরও বেশী নৈতিক সেইজন্য অনুবাদ কাব্যটি শেষপর্যন্ত ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়— এই ধরনের একটি নৈতিক ভাবনার দ্বারা গ্রস্ত হয়েছে। জায়সী দেখিয়েছেন

প্রেম সাধন শক্তির বলে অসাধ্য সাধন করতে পারে এবং সাধনা ব্যতীত প্রেম ও সৌন্দর্যকে আয়ত্ত করতে পারে এমন ক্ষমতা দিল্লীশ্বরেরও নেই; আর আলাওল দেখিয়েছেন সুলতান আলাউদ্দীন পদ্মাবতীতে দখল করতে এসে দুবার চিতের আক্রমণ করলেন কিন্তু দুবরই ব্যর্থ মনোরথ হলেন; প্রথমবার কপটসন্ধি করে রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে গেলেন, আর দ্বিতীয়কার চিতোর আক্রমণ করতে এসে বাদল ও রাজপুত সেনাদের হাতে পরাজিত হয়ে দিল্লী ফিরে গেলেন। আলাওলের কাব্যে পদ্মাবতী ও চিতোর রাজ্য দুই-ই সুলতানের অনায়ত্ত রয়ে গেল— এইভাবে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় হল। সুতরাং মূলে আছে সাধনশক্তির জয়, অনুবাদে ধর্মাদর্শের জয়।

আলাওলের এই নৈতিক ও আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যকাহিনী পরিণামের ক্ষেত্রেও একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। মূলে আছে একটি সফল প্রণয়াভিযানের কাহিনীবৃত্ত— এর নায়ক রত্নসেন, নায়িকা পদ্মাবতী এবং প্রতিনায়িকার নাগমতি। দ্বিতীয়াংশে আছে একটি বিফল প্রেমাভিযানের প্লট, যার নায়ক রত্নসেন, নায়িকা পদ্মাবতী এবং প্রতিনায়ক আলাউদ্দীন। কাব্যটি শেষ হয়েছে নায়কের মৃত্যুতে নায়িকা ও প্রতিনায়িকার সহমরণে এবং প্রতিনায়কের ক্রোধ ও চিতোর ধংস উপলক্ষে রাজপুত বীরদের যুদ্ধে আত্মোৎসর্গ এবং রাজপুত রমণীদের জহরব্রত অনুষ্ঠানে। মূলের এই ট্রাজিক পরিণাম কিন্তু অনুবাদে রক্ষিত হয়নি। অনুবাদে এর পরিবর্তে আছে রাজপুত সেনাদের কাছে সুলতানের পরাজয় ও আলাউদ্দীনের দিল্লী প্রত্যাবর্তন। রত্নসেনের মৃত্যুর পর পদ্মাবতী ও নাগমতি সহমৃতা হলে অনাথ রাজপুত্রদ্বয়কে নিয়ে সেনাপতি বাদল সুলতানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সুলতান আলাউদ্দীন রত্নসেনের মৃত্যুসংবাদ শুনে প্রভূত অনুশোচনা ও বিলাপ করে পুত্রদ্বয়কে আশ্রয় দিয়েছেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত আলাউদ্দীন ইন্দ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে চান্দেরী ও বাড়োয়া রাজ্য দান করে অনেক উপহার দিলেন। বাদলকেও রাজ্যখণ্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হল। অতঃপর সুলতান চিতোরে গিয়ে রত্নসেনের পুত্রদ্বয়কে পুত্রবৎ পালন করতে লাগলেন। কিছুকাল করে আলাউদ্দীন দিল্লী ফিরে গেলেন।

মূলে 'পদ্মাবৎ' কাব্যের প্রথম পর্বের শেষে নাগমতি ও পদ্মাবতীর গর্ভে নাগসেন ও কমলসেন নামে রত্নসেনের পুত্র-জন্মের উল্লেখ থাকলেও তাদের পরিণাম সম্পর্কে জায়সী কিছুই বলেননি, কারণ মূলের বক্তব্য প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে রত্নসেরন পুত্রদ্বয়ের

মন্তব্য

প্রসঙ্গ অবান্তর। কিন্তু আলাওল কাহিনী কথনের ক্ষেত্রে রত্নসেরন পুত্রদনবয়ের পরিণামকে সুস্পষ্ট করার জন্য একটি অতিরিক্ত অধ্যায় যোগ করেছেন। আলাওল ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, এই সুযোগে সুলতানের কৃতকমের জন্য অনুশোচনা এবং রত্নসেনের পুত্রদ্বয়কে রাজ্যদান উপলক্ষে অপরাধ ক্ষালনেরও একটা অবকাশ দিয়েছেন। সুলতানের সঙ্গে রত্নসেরন পুত্রদ্বয়ের মৈত্রী এবং সন্ধি ইতিহাসও ঘটেনি, মূল কাব্যেও নেই। এই অবাস্তব ও অনৈতিহাসিক ঘটনা সংযোজনের মধ্য দিয়ে আলাওলের একটি আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েচে বলে মনে হয়। জায়সী কাব্যপরিণামে দেখিয়েছেন যুদ্ধ এবং ধ্বংস, আলাওল দেখিয়েছেন। মৈত্রী এবং শান্তি। জায়সী কাব্যের শেষে দেখালেন পার্থিক ক্ষমতা যত প্রবলই হোক তা প্রেম ও সৌন্দর্যকে অধিকার করতে পারে না, শুধু বিরোধ এবং ধ্বংসকেই প্রবল করে তোলে। আর আলাওল দেখালেন প্রেম এবং মৈত্রীর মধ্যেই সমস্ত বিরোধের অবসান। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধ জায়সীর কাব্যে শেষপর্যন্ত রয়ে গেল, কিন্তু আলাওলের আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সুলতানের সঙ্গে রাজপুতের সন্ধি ও মৈত্রীতে এই বিরোধের অবসান ঘটল। মূল ও অনুবাদের মধ্যে শতবর্ষের এই ব্যবধানের ফলেই কি এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হল? জায়সী যখন কাব্যটি রচনা করছেন তখন দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে মোগল পাঠানোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব; সেযুগ সংাতের যুগ। সুফী কবি জায়সী সে যুগে বসে দেখিয়েছেন প্রেমের ক্ষেত্রে ক্ষমতার নিস্ফলতা। ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়ে গড়া একটি অনৈতিহাসিক উপাখ্যন অবলম্বন করে জায়সী দেখালেন ক্ষমতার দ্বারা রাজ্য পদানত করা যায় কিন্তু প্রেম লাভ করা যায় না, তার জন্য সাধনা করতে হয়। আর আলাওল যখন কাব্যটি অনুবাদ করছেন তখন আকরের দীন-ইলাহি ধর্মের শ্রেষ্ঠ উত্তর সাধ শাহজাদা দারা-শিকোহ্ দুই সাগরের মিলনের স্বপ্ন দেখছেন,— সুতরাং সেই যুগে সুদূর আরাকানে বসে সুফী কবিরূপে আলাওল যদি হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীকে আদর্শ করে তাঁর অনুবাদ শেষ করে থাকেন তাতে বিস্ময়ের কি আছে?

আলাওলের এই আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য অনুবাদকাব্যের রসপরিণাম মূলের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। জায়সীর ব্যাজিক রস অনুবাদে অনুপস্থিত। পরিশিষ্ট খণ্ডটি যোজনার ফলে আলাওলের অনুবাদ মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়েছে।

মন্তব্য

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মূলের ভাবটিকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে তার মাপসই করে আঁটকরা চলে না, মানানসই করে নিতে হয়। আলাওলের অনুবাদেও হিন্দী কাব্যকে বাংলা রূপান্তরকালে পরিবর্জন, পরিবর্তন, সংযোজন, সংক্ষেপীকরণ এবং বিস্তৃতিসাধন করা হয়েছে। ব্যাপারগুলি সূত্রনির্দেশে লক্ষ করা যাক—

১। পরিবর্জন ঃ আলাওল জায়সীর কাব্যের নিম্নলিখিত খণ্ডগুলিকে বর্জন করেছেন—

ক) সাত সমুদ্র খণ্ড

খ) নাগমতি-পদ্মাবতী বিবাদ খণ্ড

গ) স্ত্রী ভেদ খণ্ড

ঘ) বাদশাহ ভোজ খণ্ড

ঙ) উপসংহার খণ্ড

এছাড়া আলাওল প্রায়ই জায়সীর তত্ত্বমূলক দোহাগুলি বাদ দিয়ে কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

২। সংযোজন ঃ আলাওল জায়সী-বহির্ভূত নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি যোজনা করেছেন—

ক) স্তুতিখণ্ডের অন্তর্গত রোসঙ্গবর্ণনা, মাগন প্রশস্তি, আত্মপরিচয়, কাহিনী সংক্ষেপ ইত্যাদি

খ) চৌগান খণ্ড

গ) পদনমাবতী কপট দৌত্য খণ্ড

ঘ) খিল খণ্ড

তাছাড়া আলাওলকাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে স্বরচিত গীত সংযোজন করেছেন।

৩। সংক্ষেপীকরণ ঃ জায়সীর কাব্যের বর্ণনা-বিস্তার অন্তত দুটি ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত হয়েছে—

ক) নাগমতির বারমাসী বর্ণনা

খ) পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ডে বিস্তারিত রূপবর্ণনা।

৪। বিস্তৃতিসাধন ঃ আলাওলের অনুবাদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূলের ব্যাখ্যা ও বিস্তার

মন্তব্য

ক) কাকনুছ পক্ষীর বিববণ— সুফীসাধক আত্তারের পক্ষীবিবরণ গ্রন্থ অনুযায়ী প্রসঙ্গ বিস্তার

খ) পদ্মাবতী-রত্নসেন বিবাহ খণ্ডে হিন্দু বিবাহ ও বঙ্গীয় লোকাচারের বিস্তারিত বর্ণনা

গ) গমনা প্রথার বিবরণ— মাগনের অনুরোধে রাজপুত সামাজিক প্রথার বিশ্লেষণ

ঘ) গোরা বাদল যুদ্ধবর্ণনা— মূলের তুলনায় যুদ্ধ বর্ণনায় আতিশয্য ও অতিবিস্তার

৫। পরিবর্তন ঃ

ক) ঘটনা-পরিণামগত পরিবর্তন। ট্রাজেডি থেকে মেলোড্রামায় রূপান্তর।

খ) চরিত্রগত পরিবর্তন। নামে রূপে এবংসম্পর্কের ক্ষেত্রে।

সমুদ্র কন্যা — লক্ষ্মী > পদ্মাবতী; আলাউদ্দীনের সেনাপতি— সরজা > শ্রীজা; রত্নসেনের পুত্রদ্বয়— নাগসেন ও কমলসেন > চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন। শুকপাখী হিরামন> হীরামণি; গোরা বাদল> গৌরা বাদিলা; গোরা ও বাদলের মধ্যে মূলে খুড়ো ভাইপো সম্পর্ক, অনুবাদে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। মূলে অধিকাংশ চরিত্র রোমান্সধর্মী হয়েও জীবন্ত অনুবাদে চরিত্রগুলি লৌকিক কিন্তু আদর্শায়িত।

গ) দেশগত ও কালগত পরিবর্তন। মূল কাব্যের ভৌগোলিক ভূখণ্ড উত্তরপ্রদেশ এবং সময় শেরশাহের রাজত্বকাল। অনুবাদকাব্যটি শাজাহানের রাজত্বের শেষভগে প্রত্যন্তবঙ্গে বসে লেখ। উভয় কাব্যের সমাজ পরিবেশ পৃথক। কাল-ব্যবধনেরও চিহ্ন ধরা পড়েছে অনুবাদে।

ঘ) রচনারীতিগত পরিবর্তন। মূল কাব্যে আছে দোহা চৌপাই সমন্বিত পদরীতি আর অনুবাদে আছে বর্ণনাধমী পাঁচালীরীতি। একটি রীতি আর একটি রীতির থেকে স্বতন্ত্র।

পূর্বোক্ত পরিবজর্ন-সংযোজন-পরিবর্তন-সংক্ষেপীকরণ ও বিস্তৃতিসাধনের সূত্রে উভয় কবির কাব্যের তুলনা করলে তাঁদের মানস প্রকৃতি এবং রচনাভঙ্গীর পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফারসী কাব্য ও হিন্দী প্রণয়কাব্যের ঐতিহ্যানুসারী জায়সীর কবিকল্পনা মূলত রোমান্টিক এবং অনেকাংশে মিষ্টিক। সাধক কবিরূপে প্রেমের অতীন্দ্রিয় অনুভব

এবং রোম্যান্টি নিসর্গদৃষ্টি তাঁর কাব্যে লৌকিক-অলৌকিক এক অসাধারণ সৌন্দর্য মায়া রচনা করেছে। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যজাতীয় বাংলা আখ্যানকাব্যের ধারানুসারী আলাওলের বর্ণনা অনেকক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী। এর ফলে পদে পদে জায়সীর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও আলাওলের মানববিহার জায়সীর মতো এতখানি সমুচ্চ নয়। জায়সীর বর্ণনারীতিতে সংস্কৃতকাব্যের মতো ধ্রুবদী ভঙ্গী থাকলেও মাঝেমাঝেই ফারসী কবিদের মতো অতীন্দ্রিয় রহস্যে ঘেরা এমন এক ভাবের আকাশ খুলে যায় যা প্রায়ই আলাওলের অনুবাদের মধ্যে থাকে না; সেক্ষেত্রে অনুবাদ হয়ে ওঠে নিরেট তথ্য বিবরণেপূর্ণ। আলাওলের প্রকৃতি বর্ণনায় নিসর্গের বস্তুপুঞ্জ সমাবেশ যতখানি তথ্যের আমদানী করে ততটা তত্ত্বসঙ্কেতে ভাববাহী হয়ে ওঠে না। পদ্মাবতীর পূর্বরাগ বর্ণনায় আলাওলের রচনা যতোটা বিবেচক ও সাংসারিক ততোটা চিত্তবৈপ্লবিক নয়। শুকমুখে রত্নসেনের কথা শুনে জায়সীর পদ্মাবতীর যেন জননান্তর সৌহার্দ্য স্মরণে চিত্তজাগরণ হল; অন্যদিকে আলাওলের পদ্মাবতী রত্নসেনের কুলপরিচয় ও বংশমর্যাদা সম্পর্কে কৌতূহলী। জায়সী যেখানে মরমী ও রোমান্টিক আলায়ল সেক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংসারিত; তাঁদের কবিকল্পনা ও রচনাভঙ্গীও তদনুযায়ী।

রচনারীতিতে জায়সী ধ্রবদী কাব্যের ভঙ্গী অনুসারী। বর্ণনার সমারোহ, উপমার প্রাচুর্য, রূপক ও প্রতীকের প্রাধান্য, স্বার্থবোধক শব্দশ্লেষ, চৌপাই ও দোহার সুষম সমাবেশে সমানুপাতিক স্তবক বিন্যাস এবং ফারসী মসনবী রীতিতে হিন্দী স্তবকসজ্জার ধারাবাহিক অনুবর্তন তাঁর কাব্যকে এপিক ও রোমান্সের মধ্যবর্তী স্তরে নিয়ে এসেছে। আলাওল মঙ্গল কাব্যের মতো পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে পাঁচালী বর্ণনায় যে বিবরণ পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন তা আখ্যান বর্ণনার উপযোগী হলেও জায়সীর পদরীতি থেকে স্বতন্ত্র। আলাওল কাহিনী-কথনের ঝোঁকে জায়সীর বর্ণনার ঐশ্বর্যকে অনেকক্ষেত্রে বর্জন করেছেন, তার ফলে জায়সীতে স্তবকগুলি ছিল 'কথার তাজমহল', আলাওলের অনুবাদে তা অনেকক্ষেত্রে জৌলুশহীন হয়ে পড়েছে। আলাওল জায়সীর নাগমতির বারমাসীকে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যা করে ফেলেছেন। নাগমতির বারমাসী বর্ণনায় জায়সী নিসর্গ রক্তিমার সঙ্গে বিরহিণীর রক্তাশ্রুকে মিশিয়ে যে অসামান্য রূপলোক নির্মাণ করেছেন আলাওলের অনুবাদে তা নিছক বারমাসের সংক্ষিপ্ত বিরহ বর্ণনার তালিকায় পর্যবসিত। আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনায় জায়সীর

মন্তব্য

রাঘব চেতনও যেন কবি হয়ে উঠেছে। কাহিনী কথনের ঝোঁকে আলাওল সেই ধ্রুবদী বর্ণনা-মালাকে একটি গীতিকবিতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছেন। এর ফলে পদ্মাবতী-রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে পুনরুক্তি দোষ হয়তো এড়ানো গেছে কিন্তু কথাশিল্পের কারুকার্যগুলি বাদ পড়েছে। জায়সীর বর্ণনা-বিস্তারকে সংক্ষিপ্ত করার সময় আলাওল প্রায়ই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, কিন্তু পাণ্ডিত্য প্রকাশের সময় সেই বিচেনা বজায় রাখেননি। জায়সীর তত্ত্বকথাকে তিনি প্রায়শই বর্জন করেছেন, তার বদলে তথ্য সমাবেশে কাব্যকে ভারী করেছেন। পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের লোভ আলাওল ত্যাগ করতে পারেনি।

জায়সী পণ্ডিত কবি হলেও ভাষারীতিতে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য দেখাননি। তিনি তৎকালীন লোকপ্রচলিত আওধী হিন্দীতে যেভাবে কাব্যটি রচনা করেছেন তাতে ভাষার সচলতা ও সরসতা বজায় আছে। সংস্কৃত ও আরবী ফারসীতে প্রচুর দখল সত্ত্বেও তিনি অবধী লোকভাষাতেই কাব্য রচনা করেছিলেন। দেশীয় হিন্দী ভাষার প্রতিই ছিল তাঁর অনুরাগ। তিনি ফারসী বেহেস্ত্ বা আরবী কোরান্ না লিখে হিন্দীতে কবিলাস ও পুরাণ লিখেছেন। পূর্ববতী হিন্দী কবি মোল্লা দাউদ ও কুতুবনের মতোই তিনি লৌকিক ভাষারীতিরই পক্ষপাতী। এ ব্যাপারে তুলসীদাসের সঙ্গে জায়সীর প্রধান পার্থক্য এই যে, রামচরিতমানস যেখানে সন্ধি সমাস বহুল তৎসম শব্দপ্রধান, জায়সী সেক্ষেত্র লোকভাষা ও তদ্ভব শব্দের অনুরাগী। আলাওলও জায়সীর মতো তাঁর অনুবাদে যতদূর সম্ভব আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার বর্জন করেছেন। তিনিও জায়সীর মতো কবিলাস ও পুরাণ লিখেছেন, কিন্তু ভাষা ব্যবহারে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। লোকভাষার প্রতি অনুরাগ বশত জায়সী আরবী ও ফারসী শব্দ বর্জন করেছেন, আর সংস্কৃত ভাষার প্রতি আসক্তির জন্য আলাওল বিদেশী শব্দব্যবহারে অনিচ্ছুক ছিলেন। জায়সীর কাছ থেকে মাঝে মাঝে হিন্দী শব্দ ধার করলেও ভাষারীতিতে আলাওল ছিলেন সংস্কৃতপন্থী। একই স্তবকের অনুবাদে জায়সী যেখানে 'ফুল', 'কাঁটা' ইত্যাদি তদ্ভব শব্দের ব্যবহার করেছেন আলাওল সেক্ষেত্রে লিখেছেন— 'পুষ্পেত কন্টিকা'। জায়সীর পাণ্ডিত্য যেখানে কাব্যের অলঙ্কার হয়েছে, আলাওলের ক্ষেত্রে তা বোঝা হয়ে পড়েছে।

জায়সীর উপমালোকের বিশিষ্টতা শব্দশ্লেষের অর্থঘন গুঢ়তায়—সেখানে শব্দগুলি

প্রায়শ দ্ব্যর্থক এবং রূপকার্থময় হয়ে লৌকিক ও অলৌকিকের সেতু রচনা করে। আর অর্থালঙ্কারের ক্ষেত্রে মালোপমা এবং সাঙ্গুরূপকের ব্যবহারগুলি ভাবের আকাশে নীহারিকার মতো একত্রিত হয়ে কখনও অলৌকিক ছায়াপথ রচনা করে কখনও বা উপমার নক্ষত্রগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে সপ্তর্ষি মন্ডল বা কালপুরুষের মতো সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। আলাওল কাহিনী কথনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই জায়সীর অর্থগূঢ় শব্দশ্লেষকে যেমন বর্জন করেছেন তেমনি সাঙ্গরূপকের অতি আলঙ্করিকতাকে বাহুল্য বিবেচনায় ত্যাগ করেছেন। আলাওলের ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা কাব্যের প্রথাগত উপমা। তা বহুব্যবহৃত এবং গতানুগতি। আলাওলের উদ্দেশ্য ছিল জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্যকে বাংলা পাঁচালীর আকার দেওয়া। তাই প্রচলিত পয়ার ত্রিপদীর প্রথাগত ছন্দোরূপের মধ্যেই জায়সীর স্তবকগুলিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পয়ার ছন্দে পাঁচালী রচনার বঙ্গীয় রীতির সঙ্গে জায়সীর দোহা চৌপাই সমন্বিত পদরীতির মূলগত প্রভেদ। জায়সীর স্তবকবিন্যাসে যে নিটোল শিল্প সুষমা বর্তমান আলাওলের বিবৃতিধর্ম পাঁচালী রীতিতে তাকে আনা কিছুতেই সম্ভব নয়। জাসীর তত্ত্বাশ্রিত দোহা অংশগুলি প্রায়শ বর্জন করে আলাওল বাংলা রূপাতরে কাহিনীকথন রীতিকে অবলম্বন করেছেন। এরফলে ষোড়শ পংক্তিবিশিষ্ট মূলের সপ্তচরণের সাতনরী হারের মালাগুলি যদিও বা বাংলা অনুবাদে কোনোক্রমে কমবেশী টিঁকে আছে, কিন্তু দোহা অংশের মুক্তোগুলি অনেকক্ষেত্রে বাদ গেছে। াসলে জায়সীর পদ-স্তবকগুলিকে পদাবলীর রূপ দিলেই হয়ত সঠিক রূপান্তর হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো পদমালার আকারে খণ্ডগুলোকে পরিবেষণ করলে সম্ভবত এর সঠিক রূপান্তর হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো পদমালার আকারে খণ্ডগুলোকে পরিবেষণ করলে সম্ভবত এর সঠিক চরিত্র রূপটি ধরা যেত। আলাওল পাঁচালীর একঘেয়ে রীতির মধ্যে মাঝে মাঝে গীত রচনা করে আঙ্গিকে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন- এবং রাগচিহ্নিত সেই পদগুলি পড়লেই বোঝা যায়, এই মৌলি পদগানগুলিই এ কাবেযর সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ। সঙ্গীত-প্রিয় আলাওলের প্রতিভা বূলত গীতি-প্রতিভা, পান্ডিতী প্রদর্শনের লোভে এবং সারাজীবন ফরমায়েসী অনুবাদ করে তিনি নিজের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন—

সবশেষে জায়সী ও আলাওলের তুলনাটিকে কয়েকটি সাদৃশ্য ও পার্থক্যসূত্রে

মন্তব্য

নিবদ্ধ করা যেতে পারে—

১। জায়সী ও আলাওল দুজনেই ছিলেন ধর্মমতে সুফী মুসলমান। প্রথমজন ছিলেন চিশ্‌তি সম্প্রদায়ভুক্ত, দ্বিতীয়জন কাদেরি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

২। আলাওল জায়সীর মতোই কাব্যকাহিনীর আরম্ভে স্তুতিখণ্ডের মধ্যে রসুল বন্দনা, হজরত মহম্মদ ও চারজন পীরের বন্দনা করেছেন।

৩। প্রেমই উভয়ক্ষেত্রে মুখ্য উপজীব্য। যে প্রেম রাজাকে যোগী করে, দুঃসাহসিক অভিযানে ব্রতী করে এবং পরিশেষে সার্থক হয়।

৪। মূল ও অনুবাদে দুটি কাহিনীবৃত্ত বর্তমান— একটিতে আছে যোগসিদ্ধ রাজার সফল প্রণয়াভিযান, অপরটিতে আছে সাধনাহীন সুলতানের বিফল প্রেমাভিযান। প্রথম প্লটে আছে একজন পুরুষকে নিয়ে দুই নারীর দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়টিতে আছে একজন নারীকে নিয়ে দুই ঐতিহাসিক পুরুষের সংঘাত। শেষপর্যন্ত তৃতীয় এক প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের সঙ্গে দ্বৈরথ দ্বন্দ্বে নায়কের মৃত্যু এবং নায়িকাদ্বয়ের সহমরণ।

৫। অপ্রধান চরিত্রগুলিতে নাম ও সম্পর্কগত কিছু কিছু পরিবর্তন ছাড়া প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি মূল ও অনুবাদে এক। রত্নসেন এ কাবেযর নায়ক, আলাউদ্দীন ও দেবপাল প্রতিনায়ক, পদ্মাবতী ও নাগমতি নায়িকা ও প্রতিনায়িকা, গোরাবাদল প্রধান দুই সেনাপতি, শুকপাখী দূত, রাঘবচেতন শঠ, গন্ধর্বসেন ও চিত্রসেন যথাক্রমে পদ্মাবতী ও রত্নসেনের পিতা, কিন্তু রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের নাম মূলে নাগসেন ও কমলসেন কিন্তু অনুবাদে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন।

৬। আলাওল জায়সীর 'পদ্‌মাবৎ' কাব্যের অধিকাংশ খন্ডেরই অনুবাদ করেছেন। 'পদ্‌মাবৎ' কাব্যের ৫৮টি খণ্ডের মধ্যে ৫৩টি খণ্ড আলাওলের অনুবাদে আছে। ৫টি খণ্ড বর্জিত। ফারসী মসনবী রীতিতে লেখা জায়সীর কাব্যের একটানা ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই আলাওল অনুবাদটি সম্পন্ন করেছিলেন। অবশ্য খণ্ড পরিকল্পনা জায়সী বা আলাওল কারোরই নয়, পরবর্তীকালের সম্পাদকদের।

৭। বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওলের কাব্যে অনেকগুলি হিন্দী শব্দের সন্ধান মেলে যেগুলি এসেছে সরাসরি জায়সীর কাব্য থেকে। যথা আনট, আরগুজা, কুঞ্জি, খুম্ভী, গরগজা, ঘোঘট, দোহাগ, ধৌরাহর, বসিঠ ইত্যাদি। জায়সীর মতোই আলাওল আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার যতদূর সম্ভব কম করেছেন। কোরানের বদলে

লিখেছেন পুরাণ এবং বেহেস্ত এর পরিবর্তে লিখেছেন কবিলাস। অবশ্য দুজনের ভাষানীতি ছিল ভিন্ন। একজন ছিলেন হিন্দী লোকভাষার পক্ষপাতী আর অন্যজন ছিলেন সংস্কৃতের অনুরাগী। মন্তব্য

এবার জায়সী ও আলাওলের পার্থক্যগুলি সূত্রাকারে নির্দেশ করা যাক—

১। জায়সী ছিলেন কবিদৃষ্টিতে মরমী, প্রেমভাবনায় রোমান্টিক এবং বর্ণনারীতিতে ধ্রুপদী। আলাওল ছিলেন দৃষ্টিভঙ্গীতে সামাজিক,প্রেমভাবনায় সাংসারিক এবং বর্ণনারীতিতে রিয়ালিস্টিক।

২। জায়সী ও আলাওল দুজনেরই কাব্যই ethical, কিন্তু জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে আছে সাধনার ethics, আর আলাওলের অনুবাদে আছে ধর্মাধর্মের সাংসারিক ও সামাজিক নীতিবোধ।

৩। জায়সীর কাব্যের পল্ট দুটি ত্রিভুজ প্রেমের প্লট— একটি ত্রিভুজ প্রেমের সমস্যার তার আরম্ভ, আর কে ত্রিভুজ প্রেমের সমস্যায় তার সমাপ্তি। আলাওল দ্বিতীয় ত্রিভুজ প্রেমের প্লটের সঙ্গে যোগ করেছেন পুত্রদের পরিণাম-কাহিনী।

৪। জায়সীর চরিত্রগুলি রোমান্সধর্মী হয়েও জীবন্ত, আর আলাওলের চরিত্রগুলি লৌকিক হয়ও আদর্শায়িত।

৫। জায়সীর কাব্যপরিণাম ট্রাজিক, আলাওলের কাব্যের রসপরিণতি মেলোড্রামাটিক।

৬। জায়সীর ভাষাভঙ্গী একদিকে যেমন অর্থগূঢ় অপরদিকে তেমনি আড়ম্বরপূর্ণ; আলাওলের কাব্যভাষা বিবৃতিধর্মী, গীতংশ ব্যঞ্জনময়।

৭। বিসয়বস্তুতে এক হলেও মূল ও অনুবাদের আঙ্গিকরীতি স্বতন্ত্র। মূলে আছে চৌপাই-দোহার পদরীতি, আর অনুবাদে আছে পয়ার-ত্রিপদীর পাঁচালী-রীতি। এক রীতি দিয়ে অপররীতিকে ধরা যায় না।

এই পার্থক্য সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে প্রধান ঐক্য হলদুজনেই প্রেমপন্থী সুফী এবং ধর্মভাবনায় অসাম্প্রদায়িক। জায়সী একটি অমর প্রেম ও সৌন্দর্যের কাহিনী রচনা করতে চেয়েছিলেন এবং আলাওলও সেই প্রেমের কথাতে আকৃষ্ট হয়েই এই কাব্য অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। তবে দুজনের মধ্যে দেশগত, কালগত ও ব্যক্তিগত ব্যবধান থাকায় মূল ও অনুবাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও একথা

মন্তব্য

মানতে হয় জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অধিকাংশ খণ্ডের প্রত্যেকটি স্তবক ধরে ধরে আলাওল যেভাবে অনুবাদে অগ্রসর হয়েছেন এমনটি মধ্যযুগের আর কোনো বাঙালী কবি করেনি।

১৪.৫। আলাওলের পদ্মাবতীর তুলনা

আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য জায়সীর হিন্দীকাব্য 'পদ্মাবৎ' -এর বাংলা অনুবাদ। মূল কাব্যের ভাষা অবধী হিন্দী। এর ফলে অনুবাদের ভাষাতেও স্থানে স্থানে হিন্দী শব্দের নিদর্শন লক্ষ করা যায়। আলাওল আরবী ফারসী জানা মুসলমান কবি হলেও পদ্মাবতী কাব্যে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার অল্প। স্তুতিখণ্ডের অন্তর্গত রসুল বন্দনা ইত্যাদি অধ্যায়ে যেখানে কোরাণ ও হাদিসের প্রভাব আছে কেবল সেখানেই আরবী শব্দের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। জায়সীর হিন্দীকাব্যেও আরবী ফারসীর প্রয়োগ অল্প, এর কারণ লোকভাষা হিন্দী প্রতি কবির একান্ত অনুরাগ, আর আলাওলের কাব্যে বিদেশী ভাষার প্রয়োগ স্বল্পতার কারণ কবির সংস্কৃতপ্রিয়তা। বস্তুত আলাওলের পদ্মাবতীতে সংস্কৃত তৎসম শব্দের ব্যবহার খুব বেশী, এমনকি মূলে যেখানে 'ফুল', 'কাঁটা' ইত্যাদি তদ্ভব শব্দের ব্যবহার আছে অনুবাদে সেখানে পুস্প, কন্টিকা ইত্যাদি সংস্কৃতশব্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তবে তৎসম শব্দের উচ্চারণভঙ্গীতে বঙ্গালী উফভাষার লক্ষণ সুস্পষ্ট। পদ্মাবতী কাব্যের যাবতীয় পুঁথি ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত বলে পুঁথিলেখকদের পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ পদ্ধতি এ কাব্যের ভাষাকেও প্রভাবিত করেছে। আলাওল নিজেও ছিলেন ফরিদপুরের অন্তর্গত ফতোয়াবাদ অঞ্চলের লোক। চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী আরাকানে বসে কাব্যটি রচিত। পদ্মাবতী কাব্যের ভাষায় নিম্নলিখিত আঞ্চলিক উপভাষার লক্ষণগুলি লক্ষণীয়—

১। উচ্চারণে ও ধ্বনিরূপে অপিনিহিতির লক্ষণ—

সত্য > সৈত্য, > যৈক্ষ, ততক্ষণ> রক্ষক >রৈক্ষক ইত্যাদি।

* মূল কাব্যের ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে।

২। ও কারের উকার বেং উকারের ও অকারের ওকার প্রবণতা—

মনোহার >মনুহর; যোগী >জুগী; কোকিল >কুকিল

আবার— ভুবন >ভোবন; সুন্দর >সোন্দর; পুস্তক >পোস্তক; পবন >পোবন;

মহারাজ >মোহারাজ মন্তব্য

৩। পহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে এবং অল্পপ্রার ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে রূপান্তর—

যথা— ভিখারী >ভিগারি; বুঝিল >বুজিল; পন্থ >পন্ত; পুছিতে >পুচিতে

আবার— যত >জথ; যতেক >জথেক; সত্য >সথা; বাক্য >বাক্ষ ; বেশ >ভেস

৪। 'ড়'-য়ের সর্বদাই 'র'-এ পরিবর্তন

যথা— বড় >বর; বাড়িল >বারিল; ঘোড়া >ঘোরা ইত্যাদি

৫। 'চ্ছ' ধ্বনিরূপের ক্ষেত্রে 'শ' এর আগম, আবার 'স' বা ৎস ধ্বনির পরিবর্তে 'ছ' ও চ্ছ-রে ব্যবহার যথা— ইচ্ছিব >ইশ্চিব; চিকিৎসিমু >চিকিচ্ছিমু, মহোৎসব >মোহশ্চব, সুলতান >ছোলতান, ইসলাম >ইছলাম ইত্যাদি।

৬। কখনও আনুনাসিকহীনতা কখনও বা সানুনাসিকতা— পদ্মিনী >পদ্ধিনি; পদ্মাবতী >পদ্যাবতী, >পন্ধবতী; আবার— পৃথিবী >প্রিতিথমি, পিথিম্বি : উচ্চ >উঞ্চ।

পুঁথিতে স্বতোন্যাসিক্যীভবনের প্রণতাও কোথাও কোথাও লক্ষ করা যায়। যথা— ধাঞি, হাসিতে ইত্যাদি।

এছাড়া পুঁথিতে য প্রায়শই জ এবং শ, ষ ও স এর ক্ষেত্রে যথেচ্ছচারিতা লক্ষণীয়। রূপগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে অন্তামধ্য বাংলার সাধারণ লক্ষণগুলি বর্তমান। বাঙ্গালী উপভাষার বিশেষ লক্ষণগুলি দৌলত-কাজীর সতীময়না বা লোরচন্দ্রাণী কাব্যের মতো পদ্মাবতী কাব্যের ভাষাতেও লক্ষণীয়।

১। কর্ত্তৃবাচক সর্বনামের একবচনের ক্ষেত্রে— আমি, আম্মি, তুমি, তুম্মি, আপনে, আপন, মুহি, মো ইত্যাদি। কর্মকারকে আত্মচাক সর্বনামের একবচনে— আমাকে, আমা, আমারে, মোকে, মোরে, মোহক, মোহকে।

কর্মকারকে উভয়বাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে দোহে, দোহানকে, দোহানেরে কর্মকারকে 'কে' বিভক্তির পরিবর্তে কখনও কখনও 'রে' বিভক্তির ব্যবহার— যথা নৃপতিরে, স্বামীরে; কখনও বা তে বিভক্তিরও ব্যবহার— রাজাতে'। সম্বন্ধপদে আত্মবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে— আমা, মোহর ইত্যাদি ব্যবহৃত। অনুসর্গের ক্ষেত্রে 'হন্তে' বা 'হোন্তে' হতে বা থেকে অর্থে প্রায়ই ব্যবহৃত। অধিকারণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নরূপে

মন্তব্য

কোথাও প্রাচীন রূপ ‘ত’, (ঢা-পুঁথিতে) কোথাও বা আধুনিক রূপ ‘তে’ (‘বা’ পুথিতে) ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বনাম পদে ষষ্ঠী বিভক্তির ক্ষেত্রে ‘ন’ চিহ্ন; তাহার > তাহান।

২। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষের একবচন ও বহুবচনে ‘ন্ত’ এবং ‘ন্তি’ বিভক্তি ব্যবহার বিশেষ চিহ্ন রূপে উল্লেখযোগ্য। এই বৈশিষ্ট্যটি সম্ভবত সংস্কৃত ধাতুরূপের বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি চিহ্ন ‘ান্তি’র অনুরূপ। সাধারণ কালের ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষে ‘অয়’ বিভক্তির ব্যবহার হয়, যথা আছয়, পুছয় ইত্যাদি।

উত্তমপুরুষের বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের প্রাচীন রূপটি লক্ষণীয়, যথা— মাগম, বন্দম। মধ্যম পুরুষের বর্তমান কালের ক্রিয়াপদে সংস্কৃতের অনুরূপ ‘সি’ বিভক্তির ব্যবহার মধ্যবাংলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আলাওলের কাব্যেও আছে, যথা— বুঝসি, করাওসি, শুনাওসি ইত্যাদি।

বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে উক বিভক্তির প্রয়োগ, যথা— আছুক, খন্ডাউক, ক্ষেপউক, থাউক। এটাও মধ্যবাংলায় প্রচলিত। ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে— করহ, মরহ, ধরহ, বুঝহ। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে বঙ্গালি উপভাষার বৈশিষ্ট্যটি সর্বত্র লক্ষিত। যথা— দিমু, মিলাইমু, জামু, কহিমু ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কালের মধ্য পুরুষ ও প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদে দুক্ষেত্রেই ‘ইব’ বিভক্তির ব্যবহার মধ্যবাংলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আলাওলের কাব্যেও তা আছে। যথা তুমি পাইব, কে দিব ইত্যাদি।

পুরাঘটিত বর্তমান কালের ক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ দৌলত কাজী ও আলাওলের কাব্যে আছে। যথা, মানাইয়া > মানাই; সাজাইয়া >সাজাই, হারাইয়া >হারাই ইত্যাদি।

৩। পদ্মাবতী কাব্যে ক্রিয়াবিশেষ্যের ব্যবহার লক্ষণীয়, যথ, মাগন, পিন্ধন, অন্ত্য মধ্যবাংলার বৈশিষ্ট্যরূপে আলাওলের কাব্যে নামধাতুর প্রচুর প্রবহার আছে যথা, ইঞ্চিলেক, নির্মিলা, সুজিল, প্রকাশিব, বিশ্রামিল, বিবরিয়া, নমস্কারি আরম্ভিলা, বিরোধিলা, জিজ্ঞাসী, সান্ত্বাও, সান্ত্বনিল চিকিৎসিমু, নিবেদিলা। তৎসম শব্দসমৃদ্ধ আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে সেকালের কিছু কিছু প্রচলিত বাক্‌ধারা এবং শব্দ ও শব্দগুচ্ছ চোখে পড়ে। তার মধ্যে নিম্নলিখিত শব্দগুলি কবির বিশিষ্ট ভঙ্গী চিহ্নিত;

যথা, অগুণী, অনুশোচে, অন্তস্পষ্ট, অটোপ, উগয়, উঞ্চ, কুসুম্ভ, যুযায়, যাব, টুঙ্গী, তৎক্ষণ, তেকারণে, তেনমতে মোহশ্চিত ভেজ, সমসর, হামকারিলা, পুর্শক্রমে (পুরুষানুক্রমে) বণিজার।

কিছু কিছু শব্দগুচ্ছ, যথা— আস্তে ব্যস্তে, উদিত লুকিত, বিমর্ষি অবিমার্য ইত্যাদি। আলাওলের পদ্মাবতীতে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হলেও কিছু কিছু আছে, যথা, আর্জি, আদসি, কাফির, কেচ্ছা, ইনাম, ছালাম, উমরা, ছোলতান। তবে ইসলামী বিদেশী শব্দের পরিবর্তে সস্কৃত শব্দের প্রতি আলাওলের ঝোঁক বেশী। এই কারণে বেহেস্ত এর পরিবর্তে স্বর্গ এবং দোজখ্ এর বদলে নর্ক বা নরক লিখেছেন আর কোরাণের জায়গায় জায়সীর মতোই লিখেছেন পুরাণ।

আলাওলের শব্দভাণ্ডারে জায়সীর হিন্দী শব্দের প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে বর্ণানুক্রমিক একটা তালিকা দিয়ে পাশে শব্দার্থের উল্লেখ করা হল— আনট্ (পদাঙ্গুরীয়), আরগুজা (গন্ধদ্রব্য), উতারিয়া (খোলা), কাকনুছ (পক্ষীবিশেষ), কিলকিলা (সমুদ্রের নাম), কুঞ্জি (চাবি), খিরিনি (ফলবিশেষ), খুন্তী (কর্ণাভরণ), খোটিলা (কর্ণালঙ্কার), গমনা (ঘর করতে আসা স্ত্রী), গরগজা (কামান রাখার স্তম্ভ), গারুড়ী (ওঝা), ঘোঘটা (ওড়না, ঘোমটা), টোনা (যাদুমন্ত্র) ঠগলাড়ু (বিষ মিষ্টান্ন), দোহাগ (দুর্ভাগ্য) ধরাহল (ধবল গৃহ), ধৌরাহর (রাজপ্রাসাদ), নগ (রত্ন), পরেওয়া (পায়রা), পাওরি (পাবরি বা খড়ম), পাকোয়ালা (রান্না করা খাদয), ফুকার (ডাক), বড়হারা (ফলবিশেষ), বহির(বধির), বসিঠ (দূত), মনোরা ঝুমকা (হোলিগীত) ইত্যাদি।

জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্যের ভাষা শ্লেষ ও রূপক খচিত। দ্ব্যর্থবোধক শব্দশ্লেষের অর্থগূঢ়তায় জায়সীর ভাষা প্রতি পদে পদে যে প্রতীক-দ্যোতনা বহন করছে আলাওলের ভাষা ততখানি গূঢ়ার্থবাহী নয়। অনুবাদের ভাষা তৎসমবহুল বিবৃতির ভাষা। গানের ভাষাতে পদাবলীর মতো ধ্বনিঝঙ্কার থাকলেও পয়ারের ভাষা মঙ্গলকাব্যের মতোই আখ্যান বর্ণনার ভাষা। লাচাড়ি অংশের ভাষায় গীতিময়তা প্রকাশ পেলেও কাহিনি কথনের ভাষায় পাঁচালীর পদ্যাত্মকতা লক্ষ করা যায়। জায়সীর উপমা অলঙ্কারকে অনেকক্ষেত্রে অনুসরণ করলেও আলাওলের ভাষায় নিজস্ব বাকভঙ্গী এবং বঙ্গীয় বাক্‌ধারা স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র রূপকল্প রচনা করেছে। 'পিরীতি কাঞ্চন মধ্যে পড়ি গেল সীসা,' গর্বপাপ পয়োধরে না হয় গোপন' ইত্যাদি প্রবাদপ্রতিম বাণীভঙ্গীর মধ্যে

মন্তব্য আলাওলের নিজস্ব বাগবৈদগ্ধ্য প্রকাশ পেয়েছে। 'বন্ধ্যাজনে নাহি জানে প্রসব বেদন'— জায়সীর স্তুতিখণ্ডের নবমস্তবকের একটি চরণের ভুল অনুবাদ হয়েও আলাওলের কবিতা পংক্তিটি প্রবাদতুল্য।

ছন্দ—

আলাওলের পদ্মাবতী পাঁচালী জাতীয় রচনা। মধ্যযুগের পাঁচালী সাধারণত তিন ধরনের আঙ্গিকে পরিবেশিত হত। বর্ণনামূলক পয়ার, গীতাত্মক লাচাড়ী বেং সঙ্গীতময় পদ। আলাওলের পূর্ববর্তী কবি দৌলতকাজীর অনুবাদেও এই ত্রিভঙ্গীম পাঁচালী রীতি লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যেও পয়ার লাচাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপদ গান করার রীতি আছে।

আলাওলের কাব্যে বর্ণনামূলক পয়ারই বেশী। পয়ারের রীতি অনুযায়ী প্রতি পংক্তিতে আট ও ছয় মাত্রাবিশিষ্ট চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরমাত্রিক বা তানপ্রধান ছন্দে সমিল চরণগুলি পরপর বিন্যস্ত। এটাই মধ্যযুগের কাব্য পরিবেষণের সাধারণ রীতি— যথা,

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার। ৮ + ৬ = ১৪

যেই প্রভু জীবনদানে সৃজিলা সংসার।। ৮ += ৬ = ১৪

লাচাড়ী অংশে আলাওল প্রায়ই ব্যবহার করেছেন তানপ্রধান ছন্দের ত্রিপদী রীতি। ত্রিপদী রীতিতে (৮ + ৮ + ১০) ২৬ মাত্রার চরণ থাকলে লঘু ত্রিপদী এবং মাত্রার চরণ থকলে গুরু ত্রিপদী। পদ্মাবতী কাব্যের লাচাড়ী অংশে ২০ মাত্রার লঘু ত্রিপদীর পাশাপাশি ২৬ মাত্রার গুরু ত্রিপদীও আছে।

ক) লঘু ত্রিপদী— আসি রায়বার করি নমস্কার
বলে শুন গুরুদেব।
নৃপতি আদেশ কথা সবিশেষ
কহু পদ করি সেব।। (পুঃ ১২৭)

খ) গুরু ত্রিপদী— মহিমা লিখিয়া পূর্বে অনেক প্রণাম তবে
কুশল জানাই কিছু লেশ।
লিখি প্রেম অনুরাগ বিরহ বৈরাগ্য ভাগ
কার্যভাগ জানাইলা শেষ।। (পৃঃ ১৩৩)

‘পদ্মাবতী’ কাব্যের তৃতীয় আঙ্গিক হল পদগতি। পদরীতির মধ্যে আলাওলের ছন্দোবৈচিত্র্যের পরিচয় আছে। ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কে আলাওলের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাকৃতপৈঙ্গলের সঙ্গে কবির পরিচয় যে নিবিড় ছিল তা মাগন নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নানা ‘গণের’ উল্লেখ এবং শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ডে ছদ্মশাস্ত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত ছন্দের মধ্যে ভুজঙ্গপ্রয়াতের নিদর্শন আছে আলাওলের একটি পদগীতের মধ্যে— মন্তব্য

সতী সত্য ছাড়ে অতি পাপ বাড়ে
পতি প্রতি ঠারে গতি লঙ্কাগারে।
পিতা-শীল নাশে হিতাহিত হাসে
শুভকৃতি পাশে কুকৃতি প্রকাশে। (পৃঃ ৩৪৩)

মালিনী ছন্দের নিদর্শন আছে নাগমতির ভাটিয়ালী রাগের বিলাপে—

সুখভোগে গোঙাইলু কাল।
কোন হেতু পড়িল জঞ্জাল।।
শুক পক্ষী হৈল মোর কাল।
জানিলু করন নহে ভাল।। (পৃঃ ৯৯)

তিন জাতীয় বাংলা ছন্দের মধ্যে আলাওলের পদগীতে তানপ্রধান ও ধ্বনিপ্রধান ছন্দের ব্যবহারই চোখে পড়ে। ধ্বনি প্রধান ছন্দের মধ্যে ছয়মাত্রার চালটিই বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলা এবং ব্রজবুলি দুজাতীয় পদেই ছয়মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বিন্যাসটি লক্ষণীয়। যথা, বিদ্যাপতির অনুসরণে আলাওলের— ‘আজি সুখেরনাহি ওর’ পদের অংশ বিশেষে—

সুধা রসময় নিধি
আনি মিলাইল বিধি।
বহুল যতনে দেব আরাধনে
ভেল মনেরথ সিধি। (পৃঃ ২৬০)

একই চালের ছন্দ আছে আর একটি ত্রিপদী ঢঙের পদে—

কহিও নৃপতি আগে মোর মন অনুরাগে।

মন্তব্য

যে সকল দুখ তাহান শরীরে

আমার পরাণে লাগে।। (পৃ: ১৪৫)

ছয়মাত্রার ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অন্যচালের বাংলাপদ—

ওহ বড়ি ঠেটা কুটিল কুলটা

পাট কুবচন শূন্যও সে রে।

অরল গারি কুল মহাকালি

ধিক ধিক সরাও অচিরে।। (পৃ: ৩৪৬)

সাত মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের নিদর্শন, যথা—

কাল বিষধর অধিক ঘোরতর

তবো নিতি তমো াধিকারী রে।

চপলা চকচক জীবন ধকধক

বিরহ বেদনা ভারি রে।। (পৃঃ ৩৪১)

চার + চার = আট মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের নিদর্শন, যথা—

তুয়াপদ হেরইতে রাতুল নয়নযুগ

কামিনীমোহন কটাখহীন ভেল।

প্রেমামোদে বিহ্বল সতত বহয় লোর

অবয়ব পরিহরি শুদ্ধি বুদ্ধি গেল।। (পৃঃ ১৯২)

অথবা জয়দেবানুসারী পদটি—

বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে।

বরবালা মুখ ইন্দু স্রবে সুধা বিন্দু বিন্দু

মৃদুমন্দ ললিত অধর মধুহাসে। (পৃঃ ২০৭)

তানপ্রধান ছন্দের মধ্যে লঘুচালের লঘু ত্রিপদী ছন্দটি আলাওলের একাধিক পদগানের মধ্যে লক্ষ করা যায়। রত্নসেন পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডের ান্তর্গত বসন্তরাগের পদটি—

কেশ কুরাইয়া কুসুমে রচিয়া

গুন্থিল ত্রিগুণ বেণী।

পাটের থোপন কনক বন্ধন

বিরাজিত রত্নমণি।। (পৃ: ১৭৬)

আবার লঘু ত্রিপদীতে শুরু হয়ে গুরু ত্রিপদী ছন্দে পরিবর্তিত হওয়ার একটি গীতি নিদর্শন— মন্তব্য

শ্রবণ নয়ন মন বুদ্ধি জ্ঞান
এক না আসয় কাজে।
যে কিছু করম পাঠ বিফল যেহেত নাট
সেই পুনি অন্তরে বিরাজে।। (পৃ: ৫৩)

তানপ্রধান একাবলী ছন্দের (৬ ৫ মাত্রা) একটি চমৎকার নিদর্শন—

কুটিল কবরী কুসুম সাজ।
তারকমণ্ডলী জলদমাঝ।। (পৃ: ২৭৪)

জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্য আওধী হিন্দী কাব্যের ধারা অনুযায়ী 'চৌপাই' ও 'দোহা' সমন্বিত ষোড়শ পংক্তির স্তবকমালা নিয়ে গঠিত ফারসী মসনবী-রীতির কাব্য। আলাওল একে বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে মধ্যযুগীয় বাংলা পাঁচালী রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে বর্ণনাত্মক পয়ার, গীতাত্মক লাচাড়ি এবং সঙ্গীতময় পদরীতির ত্রিবিধ প্রয়োগে ছন্দের নানা বৈচিত্র্য এসেছে যা মূলে ছিল না। তবে মূলের কাব্যরীতি স্বতন্ত্র, পয়ার-লাচাড়ির পাঁচালী রীতি দিয়ে সেই রীতিকে ঠিক ধরা যায় না।

১৪.৬। জায়গীর পদ্মাবৎ কাব্য আসলে চৌপাই ও দোহার মিলিত পদগীতি

জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্য 'চৌপাই' ও 'দোহা' মিলিত পদগীত। কথিত আছে কবির কোনো এক শিষ্যের মুখে নাগমতির বারোমাসী গান শুনে অমেথীর রাজা কবিকে রাজসভায় নিয়ে আসেন। খারসী মস্‌নবী রীতিতে লেখা জায়সীর কাব্যগাথা গেয়কাব্য। আলাওল পাঁচালী রীতিতে কাব্যটি অনুবাদ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে মঙ্গলকাব্যের বিষ্ণুপদের মতো স্বরচিত পদ সংযোজিত করেছেন। এই পদগুলির বিষয় অনেকক্ষেত্রেই মৌলিক, এগুলি জায়সীর অনুবাদ অংশ নয়। প্রত্যেক পদের শীর্ষে রাগের নাম আছে, কখনও কখনও ছন্দের ও তালের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্রও তাঁর কাব্যের অধ্যায়শীর্ষে গীত যোজনা করে আখ্যানকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র এনেছেন।

আলাওল ব্যক্তিজীবনে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি সম্ভবত মাগনের সঙ্গীতগুরু ছিলেন। 'রাগতালানামা' অর্থাৎ রাগ ও তালের নির্দেশগ্রন্থ আলাওলের নামে পাওয়া

মন্তব্য

যায়। মাগন নিজে সঙ্গীতরসিক ছিলেন, তাঁর সভায় যাঁরা াসতেন তাঁদের মধ্যে থাকতেন ‘নানাগুণে পারগ সঙ্গীত জ্ঞাতাগুণী।’ এই সভাসদদের কথা বেবেই আলাওল গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন।

পদ্মাবতী কাব্যের দুটি স্থানে সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা আছে। একটি, শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ডে রত্নসেনের পাণ্ডিত্য-পরীক্ষা স্থলে, অপরটি রাজা-বাদশাহ যুদ্ধ খণ্ডে রত্নসেনেরসভায় নর্তকীর নৃত্য বর্ণনা উপলক্ষে। প্রথমটিতে আছে সঙ্গীত রত্নাকর এবং সঙ্গীতদর্পণ অনুযায়ী নাদতত্ত্ব পররসঙ্গে বাদ্যশাস্ত্রের আলোচনা; দ্বিতীয়টিতে আছে নারদের সঙ্গীতশাস্ত্র অনুযায়ী সঙ্গীত ও নৃতকলার বর্ণনা প্রসঙ্গে স্থায়ীভাব, সঞ্চারীভাব, সঞ্চারীভাব ও সাত্ত্বিক ভাবের পর্যালোচনা। শুভঙ্করের ‘সঙ্গীত দামোদর’ গ্রন্থে বাদ্যকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, তত বা তার বাদ্য, বিতত বা বিনাতারের বাজনা, সুষির অর্থাৎ ফুৎকার বাদ্য, ঘন বা চর্মবাদ্য এবং অনাহত বা মুখবাদ্য। আলাওল এই পাঁচপ্রকার ধ্বনিকে দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করেছেন। ‘তার’ বাদ্যের দৃষ্টান্ত হল কপিনাস, বেতার বাদ্যের নিদর্শন মদির, ফুৎকারবাদ্যের দৃষ্টান্ত উপাঙ্গ মুরচঙ্গ ইত্যাদি, চর্মবাদ্যের দৃষ্টান্তরূপে আলাওল মুরজ ও দুন্দুভির উল্লেখ করেছেন, এবং অনাহত ধ্বনি বলতে আলাওল মুখবাদ্যের কথা বলেছেন। অতঃপর শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতদর্পণ অনুযায়ী আলাওল পঞ্চমশব্দ অনাহত সম্পর্কে ভিন্নমতের উল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেবের মতে অনাহত বা পঞ্চম স্বর হল পূর্বোক্ত চারপ্রকার শব্দের ঐক্যতান।

রাজা-বাদশাহ যুদ্ধ খণ্ডে নর্তকীর নৃত্যবর্ণনা প্রসঙ্গে আলাওল সেকালের নৃত্য গীতের একটি প্রত্যক্ষ চিত্র দিয়েছেন। সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং ব্রহ্মার নামোল্লেখের পর রাগ উচ্চারণ করে সঙ্গীতের আরম্ভ হল। প্রত্যেক শব্দকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে তাতে তানের বিস্তার হল। বিপক্ষ সুর বর্জন করা হল। তেওট বা তেওড়া তালে ধ্রুবপদ ও বিষ্ণুপদ গাওয়া হল। রাগের সঙ্গে শ্লোক বা পদ মিশিয়ে গান হতে লাগল। তার সঙ্গে বাজতে লাগল মন্দিরা ও ডম্বরু। নৃত্যের গতিতে নর্তকীর কোমরের গোট বা বিছে কুমোরের চাকার মতো ঘুরতে লাগল। তালে তালে কিঙ্কিনীধ্বনি হতে লাগল। অতঃপর নারদোক্ত সঙ্গীতশাস্ত্র অনুযায়ী আলাওল স্থায়ীভাব এবং আটপ্রকার সাত্ত্বিকভাব বর্ণনা করলেন। সবশেষে অভিনয় রীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আলাওল দ্রুত পরবর্তী ঘটনা প্রসঙ্গে প্রস্থান করেছেন।

মন্তব্য

এইবার আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের অন্তর্গত পদগীতগুলির পরিচয় নেওয়া যাক। ডঃ সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড অপরার্ধে ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে সবশুদ্ধ গোরোটি গীতের সংখ্যা নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বর্তমান সম্পাদনায় আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে রাগচিহ্নিত তেরোটি পদগানের সন্ধান মিলছে।

খণ্ডানুযায়ী পদগীতগুলিকে প্রথম পংক্তি নির্দেশ করে পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ সূচীবদ্ধ করা হল।

১। শ্রবণ নয়ন মন বুদ্ধি জ্ঞান... শুক খণ্ড... রাগ কেদার... পৃঃ ৫৩।

২। সুখ ভোগে গোঙাইলু কাল... যোগী খণ্ড... ভাটিয়াল... পৃ: ৯৯

৩। তুমি পক্ষী প্রিয়তম... গন্ধর্বসেন মন্ত্রী খণ্ড... শ্রীগান্ধার... পৃঃ ১৪৫।

৪। চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী... বিবাহ খণ্ড... কর্ণাট রাগ... পৃ:১৮০।

৫। তুয়া পদ হেরইতে রাতুল নয়ন যুগ...ভেঁট খণ্ড... শ্রীরাগ... পৃ: ১৯২।

৬। বসন্তে নাগর বর নাগরী বিলাসে... ষট্‌ঋতু বর্ণন খণ্ড... বসন্তরাগ...পৃ: ২০৭

৭। তোমার কৃপার বলে আপনার পাপ ফলে... পদনমা সমুদ্র খণ্ড... ভাটিয়াল... পৃ:২৪৮

৮। আজি সুখের নাহি ওর... চিতোর আগমন খণ্ড... সুহি রাগ... পল: ২৬০

৯। কুটিল কবরী কুসুম মাঝ... পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ড... শ্রীগান্ধার রাগ... পৃ: ২৭৪

১০। বরিখে লোচন অম্বুজ সঘন... দেবপাল দূতী খণ্ড...সুহি রাগ... পৃ: ৩৩৬।

১১। গগনে গরজ যেন সঘন ঘন ঘন... দেবপাল দূতী খণ্ড... মল্লার রাগ... পৃ: ৩৪১

১২। সতী সত্য ছাড়ে অতি পাপ বাড়ে... ঐ... ভৈরবী রাগ... পৃ: ৩৪৩

১৩। ওহে বড়ি ঠেটা কুটিল কুলটা... ঐ ... আশাবরী রাগ... পৃ: ৩৪৬

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা গেল শূক খণ্ড থেকে পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ড পর্যন্ত কয়েকটি খণ্ডে একটি করে পদ এবং দেবপাল দূতীখণ্ডে আছে সর্বাধিক মোট চারটি পদ। দেবপাল দূতী খণ্ডের পর থেকে আর কোন পদ নেই। যুদ্ধ ঘটনা বর্ণনায়

মন্তব্য ব্যস্ত থাকাই কি পরবর্তী পদ নিঃশেষের কারণ? ইতিপূর্বের যুদ্ধবর্ণনার খণ্ডগুলিতেও (বাদশাহ আক্রমণ খণ্ড, রাজা বাদশাহ যুদ্ধ খণ্ড) পদ নিদর্শন বিশেষ লক্ষ করা যায় না। পদগানের জন্যে ভাবের যে অবকাশ থাকা দরকার যুদ্ধ ঘটনার মধ্যে তার ফাঁক পাওয়া কঠিন। কাব্যের শেষভাগযুদ্ধ ও মৈত্রীর অতিনাটকীয় ঘটনাজালে এমনই সমাচ্ছন্ন যে পদগান যোজনার অবসর ও অবকাশ কোনোটাই কবির মেলেনি।

আলওলের পদ্মাবতী অন্ত্যমধ্যযুগের পাঁচালী রীতির আদর্শে রচিত। সেকালের পাঁচালী রীতিতে তিন ধরনের রচনাংশ থাকত—

এক) বর্ণনামূলক পয়ার— এগুলি মূলত আবৃত্তি বা গীতোপযোগী অংশ

দুই) গীতাত্মক লাচাড়ি— এগুলি প্রধানত রাগযুক্ত নৃত্যানুকূল দ্বিপদী গীত

তিন) পদগীত— তালে এবং রাগে গৈয় পদ।

আলাওলের পাঁচালীতে এই তিন ধরনের পরিবেষণ রীতিই লক্ষণ করা যায়। ভণিতায় আলাওল প্রায়ই বলেছেন ‘পয়ার রচিয়া কহে হীন আলাওল’; এমন কি যখন ত্রিপদীতে দীর্ঘ ছন্দের লাচাড়ি ‘লখছেন তখনও ভণিতায় বলছেন—

সদগুণ দয়াল ধীর পুণ্যবন্ত দাতা বীর
শ্রীযুদ মাগন রসোদধি।
আরতি শুনিয়া তান হীন আলাওল ভাণ
সুপয়ার রসের অবধি।। (পৃ: ১৭৪)

অথব অন্যত্র— সদগুর মাগন নাম রোসাঙ্গেত অনুপাম
আলাওলে শুনিয়া আরতি।
ভাঙ্গিয়া চৌপাই ছন্দ রচিল পয়ার বন্ধ
পদে পদে অমৃত ভারতী।। (পৃ: ১০৭)

এক্ষেত্রে পয়ার বলতে আলাওল ছন্দোবিশেষকে নির্দেশ করেননি, সুরসংযোগে আবৃত্তি ও গীতোপযোগী পদবন্ধকে বুঝিয়াছেন। ৮ + ৬ মাত্রাবিশিষ্ট আলাওলের পয়ারবন্ধগুলি কোথাও আবৃত্তিযোগ্য কোথাও বা গীতোপযোগী। আবৃত্তিযোগ্য পয়ারের শীর্ষদেশে রাগের উল্লেখ নেই, সেগুলি নিছক বর্ণনাত্মক। কিন্তু কোনো কোনো

বমক ছন্দের শীর্ষে রাগের উল্লেখ আছে সেগুলি ভাবাত্মক এবং গীতাত্মক; যেমন রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডের অন্তর্গত ১৬৭ পৃষ্ঠায় পয়ারটি কামোদ রাগে এবং ১৭৫ পৃষ্ঠার পয়ারটি মালসী রাগে গাইতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া আছে। দীর্ঘ ছন্দের লাচাড়িগুলি প্রধানত দীর্ঘ ত্রিপদী, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘ ছন্দ বলেই নির্দেশিত। রত্নসেন-পদ্মাবতী ভেঁট খণ্ডের অন্তর্গত ২০১ পৃষ্ঠার দীর্ঘ ছন্দের ত্রিপদটি লাচাড়ি বলেই নির্দেশিত। অন্যত্র 'দীর্ঘ ছন্দ' বলে উল্লেখ করে কখনও কখনও রাগের নাম দেওয়া আছে; যেমন রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডের অন্তর্গত ১৭০ পৃষ্ঠার ও ১৮১ পৃষ্ঠার ত্রিপদী দুটির শীর্ষদেশে ধানসী রাগের উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত পয়ার ও লাচাড়ি ব্যতীত পদ্মাবতীতে তৃতীয় প্রকার রচনাংশ হল পদগীত— এই গানগুলি কখনও বাংলায় কখনও বা ব্রজবুলিতে রচিত, কোনো কোনো গান জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদের দ্বারা প্রভাবিত, এগুলি ধ্রুবপদযুক্ত রাগ ও তালচিহ্নিত মধ্যযুগের প্রবন্ধ সঙ্গীত। মন্তব্য

আলাওল যদিও সারাজীবন ধরে আখ্যান কাব্যের অনুবাদ করে এসেছেন, তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে গীত রচনার ক্ষেত্রে। এই সঙ্গীতজ্ঞ কবির স্বক্ষেত্র হল পদরচনা। কেবল পদ্মাবতী কাব্যেই নয়, অন্যান্য অনুবাদ কাব্যেও তিনি স্বরচিত গীত সংযোজিত করেছেন সয়ফুল মূলক-বদীউজ্জমাল গ্রন্থের অন্তর্গত একটি পদে বৈষ্ণব কবির আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। পদটি সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থে উদ্ধৃত—

আহা মোর বিদরে পরাণ।

জাগিতে স্বপন দেখি ভুমে নাহি আন।। ইত্যাদি

সতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সম্পাদিত বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি গ্রন্থটিতেও আলাওলের রচিত বৈষ্ণব পদের নিদর্শন আছে। আলাওলের পূর্ববর্তী কবি দৌলত কাজীও তাঁর সতী ময়না বা লোরচন্দ্রাণী গ্রন্থে ময়নার বারবাসী বর্ণনায় বৈষ্ণব পদের অনুসরণে জয়দেবীয় পদরচনা করেছিলেন। মালিনী ও ময়নার উক্তি প্রত্যুক্তিগুলিতে ধ্রুবপদ বিশিষ্ট গীতের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তাতে বোঝা যায় যে পাঁচালী জাতীয় রচনায় পদগীতের ব্যবহার আরাকান রাজসভাতেও অজানা ছিল না। দৌলত কাজীর কাব্যে ময়নার একটি ধ্রুবপদে (মালিনি কি কহব বেদন ওর। লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর।।) যেমন বিদ্যাপতির পদের প্রভাব লক্ষ করা যায়, তেমনি বালিনীর প্রত্যুক্তি পদের বাণীভঙ্গীতে জয়দেবের ভাষা ও ছন্দের প্রভাবও লক্ষণীয়। যথা—

মন্তব্য ভাদ্য মাসে চন্দ্রমুখী সুচরিতা কামিনী

বসতি তিমিরে অতি ঘোরৎ।

অধর মধুরৌ তাম্বুল বিনা ধূসরৌ

নিচল চকোর আঁখি ঝোরং।। ইত্যাদি

আলাওলও পদ্মাবতী কাব্যের গীতগুলি বৈষ্ণাপদাবলীর ছাঁচেই গড়েছেন। কোনো পদ ব্রজবুলিতে, কোনো পদ বাংলায় আবার কোনো পদ জয়দেবীয় সংস্কৃতের অনুসরণে রচিত। ষট্ঋতুবর্ণন খরেডর অন্তর্গত বসন্ত রাগে গেয় বসন্ত বিলাসের পদটি জয়দেবের ভাষা ভঙ্গীর ছাঁকা অনুকরণ। যথা—

পল্লবিত বনস্পতি কুটজ তমাল দ্রুম

মুকুলিত চুতলতা কোরক জালে।

যুবজন হৃদয় আনন্দ পরিপুঞ্জিত

লবঙ্গ মল্লিকা মালতী মালে।। (ইত্যাদি ২০৭ পৃষ্ঠা)

জয়দেবের বসন্ত রাসবর্ণনার পদাংশ বিশেষ এর সঙ্গে তুলনীয়—

মৃগমদসৌরভ রভসবশংবদ নবদল মালতামালে।

যুবজনহৃদয় বিদারণ মনসিজ নখরুচি কিংশু জালে।। (ইত্যাদি)

আবার চিতোর আগমন খণ্ডে রত্নসেনের সঙ্গে নাগমতির মিলনের দৃশ্যে যে সুহি রাবের গীতটি সংযোজিত হয়েছে তার সঙ্গে বিদ্যাপতির ভাবোল্লাস পদটি তুলনীয়—

আজি সুখের নাহি ওর

আনন্দে মন বিভোর।

চির পতি আশে চিত্তের মানসে

নাগর সদনে মোর।। (পৃঃ ২৫০)

তুলনীয়— কি কহব রেসখী আনন্দ ওর।

চিাদিন মাধব-মন্দিরে মোর।।

আলাওলের পদগুলি সংস্কৃত, বাংলা এবং ব্রজবুলি এই তিন রকম ভাসা ভঙ্গীতেই রচিত। পদ্মাবতী কাব্যের কিছু কিছু গান তৎসব শব্দমাকীর্ণ স্তোত্রগীতি। যেমন পদ্মাবতী

রূপচর্চা খণ্ডে আলউদ্দীনের কাছে রাঘবচেতনের রূপবর্ণনা উপলক্ষে একাবলী ছন্দের মন্তব্য গান—

কুটিল কবরী কুসুম সাজ। তারক মণ্ডলি জলদ সাজ।।
সুর শশী দোহ সিন্দুর ভাল। বেড়ি বিদুম্ভদ অলকা জাল।
সুন্দরী কামিনী কাম বিমোহে। খঞ্জন গঞ্জন নয়ানে শোহে।। (পৃ: ২৭৪)

জায়সীর বিস্তারিত রূপবর্ণনাকে আলাওল সংস্কৃত ভাষাভঙ্গীতে সংযত ও সংহত করে স্ত্রোত্রগীত করে তুলেছেন। অনুরূপ আর একটি স্ত্রোত্র গান আছে বিবাহখণ্ডের অন্তর্গত পদ্মাবতীর বিবাহযাত্রার বর্ণনায়। আলঙ্করিক রূপ বর্ণনার সঙ্গে সালঙ্কারা ভাষাভঙ্গী মিশে পদটি ধ্রুপদী উচ্চারণ—

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী খঞ্জন গঞ্জন শোভিতা।
কিঙ্কিনী ঘুঁঘর বাজয় ঝাঁঝর ঝনাঝন নেপুর মধুর গীতা।।
ভুরু বিভঙ্গ মন্মথ মন মোহিতা।
কুটিল কেশ কুসুম সুবেশ সিন্দুর চন্দন তিলক তথা।। (পৃ: ১৮০)

এই ধরনের পদে গোবিন্দদাসের পদাবলীর সংস্কৃত ভাষাভঙ্গী এবং ছন্দোগাম্ভীর্য লক্ষ করা যায়। আলাওলের কিছু কিছু গান বাংলা ভাষায় রচিত। অধিকাংশ বিলাপোক্তি চন্ডীদাসের পদের মতো সরল বাংলা ভাষায় লেখা যা কানের ভিতর দিয়ে মর্মকে স্পর্শ করে। যোগীখণ্ডের অন্তর্গত নামমতির বিলাপ—

সুখ ভোগে গোঙাইলু কাল।
কোন হেতু পড়িল জঞ্জাল।।
শুক পক্ষী হৈল মোর কাল।
জানিলু করম নহে ভাল।। (পৃ: ২৪৮)

এই গানের সঙ্গে ভাষায় রচিত বৈষ্ণব প্রার্থনা পদের আন্তর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। দেবপাল দূতী খণ্ডে পদ্মাতীর মুখে কয়েকটি বিলাপগতি বসানো হয়েছে। সেগুলি ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষাতে রচিত, কিন্তু এদের ছন্দোভঙ্গীতে এমন চটুল চাপল্য আছে যে তা ঠিক বেদনা বিলাপের উপযোগী হয়ে ওঠেনি। যথা ভুজঙ্গপ্রয়াতে পদ্মাবতীর বিলাপ—

মন্তব্য

সতী সত্য ছাড়ে অতি পাপ বাড়ে
পতি প্রতি ঠারে গতি লঙ্কাগারে।
পিতা শীল নাশে হিতাহিত হাসে
শুভ কৃতি পাশে কুতি প্রকাশে। (পৃ: ৩৩৪)

ছন্দের নাচুনি এ পদে যতোটা আছে বিলাপের কাঁদুনি ততোটা বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেনি। ব্রজবুলিতে লেখা একাধিক পদ পদ্মাবতীতে আছে। এর মধ্য ভেট খণ্ডের অন্তর্গত পদ্মাবতীর প্রতিরত্নাসেনের প্রেমার্তিমূলক সখীবচনটি উৎকৃষ্ট— (পটি গোবিন্দদাসের পূর্বরগ পদের অনুরূপ)।

তুয়া পদ হেরইতে রাতুল নয়ন যুগ
কামিনী মোহন কটাখ হীন ভেল।
প্রেমামোদে বিহ্বল সতত বহর লোর
অবয় পরিহরি শুদ্ধি বুদ্ধি গেল। (পৃ: ১৯২)

পদের ধ্রবপদটি অবশ্য জয়দেবীর ভাষাভঙ্গীর স্মারক—

চল চল পেরমহ প্রভুর সে তল্পে।
অরদি মতি পতি গতি অতি অল্পে।।

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের ব্রজবুলী পদচর্চার আরও দুটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে দেবপাল-দূতী খণ্ডের মধ্যে। একটি পদ্মাবতীর অপরটি দেবপাল দূতী কুমুদিনীর প্ররোচনা। দৌলত কাজীর সতী ময়না কাব্যের ময়না ও মালিনীর পদগীতের মতো এখানেও পদ্মাবতী ও কুমুদিনীর মুখে পদাবলী বসিয়ে বিলাপের গীতিমাল্য রচিত হয়েছে।

পদ্মাবতী কাব্যের অনেকগুলি গীতই সধ্রুবা প্রবন্ধ সঙ্গীত। ধ্রুবপদটিনিয়ে গানগুলিতে চারটি অথবা পাঁচটি করে স্তবক আছে। প্রথমে একটি উদ্‌গ্রাহ স্তবক, অতঃপর মেলাপক, তাহপরে ধ্রুবপদ, অবশেষে আভোগ অথবা অন্তরার পরে আভোগ। আভোগের শেষাংশে ভণিতা। কখনও কখনও ধ্রুবপদ দিয়েই গানের আরম্ভ, তারপরে অন্যান্য অংশগুলি বর্তমান। এক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখিয়ে দেওয়া যাক—(পদটি মেলাপক বর্জিত ধ্রুবপদা গীত)

বরিখে লোচন অম্বুজ সঘন মন্তব্য

আর কি বহন সব কেশা।

জীবন বচন পহু বিনে নাহি ভায়

এবে ভেল মরণ সন্দেশা।।... (উদগ্রাহ)

সজনি বাম এসব বিহীনে ভেলা।

নিঘটন নাথ নব ফুল পবন

অবয়ব অধিক জ্বালা

অলি পিক চাক মোরক কপোত বক

শ্রুতি কৃপীট বিশালা।।... (অন্তরা)

হীন আলাওল কহে বিরহিণী বেদন

শুনি শুনি দ্রবয় পাষাণ

শ্রীযুত মাগন রসিক সুনায়র

মহী পুরি কীর্তির বাখান।।...(আভোগ) (পৃ: ৩৩৬)

আবার ধ্রুবপদটি প্রথমে রেখে উদগাহ, মেলাপক, অন্তরা ও আভোগ সহ গীতের দৃষ্টান্ত চিতোর আগমন খণ্ডে নাগমতির মিলন সুখোল্লাসের পদ 'আজি সুখের নাহি ওর।' অবশ্য পদ্মাবতী কাব্যের সব গীতই যে প্রবন্ধ সঙ্গীতের এই নির্দিষ্ট অঙ্গ বিভাগ অনুসরণ করে চলেছে তা নয়। প্রথমদিকের অনেকগুলি গানই আকারে অনেক বড়। সেগুলিতে পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ থাকাও অসম্ভব নয়। পুঁথিতে পদ্মাবতী কাব্যের গানগুলি এতই বিকৃত যে তার থেকে শুদ্ধরূপটি বের করে আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

জায়সীর চৌপাই ছন্দকে ভেঙে আলাওল পদ্মাবতী কাব্যকে মধ্যযুগের পাঁচালীর রূপ দিয়েছিলেন। সেকালের পাঁচালী কাব্যের রীতি অনুযায়ী পদ্মাবতীতেও কাব্যপরিবেষণের তিনপ্রকার রীতি অবলম্বিত হয়েছে। এক বিবৃতিধর্মী পয়ার যা মূলত পাঠ বা সুরে আবৃত্তি করা হত। দুই, গীতিধর্মী লাচাড়ি যা নাচে ও গানে পরিবেষিত হত। তিন, পদ গীত, যা রাগ ও তাল সহযোগে গান করা হত। এই ত্রিবিধ আঙ্গিকের

মন্তব্য

সাক্ষ্য পদ্মাবতীতে আছে। রাগচিহ্নহীন যমক ছন্দে আছে পয়ারের পাঠনির্দেশ, রাগযুক্ত দীর্ঘছন্দের মধ্যে লাচাড়ির চিহ্ন এবং রাগ তালাযুক্ত পদগুলি হল প্রবন্ধ সঙ্গীতের নিদর্শন।

১৪.৭। আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে ধর্মবোধ ও সুফী প্রভাব আলোচনা করো।

২। পদ্মাবতী কাব্যের ঐতিহাসিকতা উল্লেখ করো।

৩। পদ্মাবতী কাব্যের সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় দাও।

৪। মহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ ও আলাওলের পদ্মাবতীর তুলনা করো।

৫। অনুবাদক হিসাবে মালিক মহম্মদ জায়সীর কৃতিত্ব উল্লেখ করো।

৬। পদ্মাবতী কাব্যে যে ভাষা ও ছন্দ পরিলক্ষিত হয় তার নিদর্শন দাও।

৭। পদ্মাবতী কাব্য আসলে তেরোটি পদগানের সমাহার উল্লেখ করো।

১৪.৮। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - দেবেশ আচার্য।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রীমন্ত কুমার জানা (অখণ্ড)।

৩। পদ্মাবতী সম্পাদনায় - দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)।